প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক—শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট—শ্রীধ্রুব রায়

তিন টাকা

শ্রীমান কমল দে,

নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু।

নীলকণ্ঠের আরও বই :

চিত্র ও বিচিত্র ॥ বসন্ত কেবিন ॥ অন্য ও প্রত্যহ ॥ জীবনরঙ্গ ॥ নববৃন্দাবন ॥ দ্বিতীয় প্রেম ॥ একটি অশ্রু, দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ ॥ আসামী কারা ॥ হ-রে-ক-র-ক-ম-বা ॥ এলোমেলো ॥ ট্যাক্সির মিটার উঠছে ॥ বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র ॥

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের

শৌলমারী আশ্রমের রহস্য ॥

এক

'ইতিহাসে অনেক পাগল আছে, কিন্তু পাগলদের কোন ইতিহাস নেই'—ডাক্তারের গলা ভারি করে তুলল ঘরের হাওয়াকে।

বেয়ারা এসে উঠিয়ে দিয়ে গেল খস্ খস্। আর দরকার নেই। প্রথম ফাল্গুনে ইভনিং ইন ক্যালকাটা সত্যিই মনোরম। হাওয়া দিচ্ছে অল্প অল্প ; ঘরের থেকে ঘরের লোককে বেশি ডাকছে ঘরের বাইরে। সেখানে মখমলের মত মসৃণ লনে এসে বসেছিল শেষ যে দুচারটে কাক, তারা এখন বাসায় ফিরবে। সূর্যি মামা পাটে বসবে আর একটু বাদেই। ডাক্তারের চেম্বারে আসতে থাকবে রুগীরা। সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে গুড্‌বায় করলাম ডাক্তারকে। কাল আবার আসব।

ডাক্তারের নাম ? জিজ্ঞাসা করলেও জবাব দিতে বারণ। নাম না বলবার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিতে রাজি হয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতার ইতিহাস খুলে ধরতে। পাত্র-পাত্রীদের নাম নিতে বারণ করেছেন, তার একটা মানে পাই। প্রফেসন্যল ডিকোরাম। কিন্তু ঐ সঙ্গে প্রথম ও প্রধান সর্ত করেছেন ঃ তাঁর নামও করা চলবে না। কেন করেছেন, ভেবে পাই না। জিজ্ঞেস করলে বলেছেন, পাগলের ডাক্তার, হয়ত এটা আমার একটা পাগলামী—এই বলেই ধরে নাওনা কেন ?—অর্থাৎ উত্তর এড়াতে চেয়েছেন। পাগল নিয়ে কারবার শুধু সেয়ানা পাগলের পক্ষেই সম্ভব।

পাঠকের কৌতূহল মেটাতে এবং পাঠিকার বাড়াতে এইটুকু বলতে পারি যে, শুধুমাত্র নামের এবং পদবীর আদ্যক্ষর, ইংরাজিতে যাকে বলে ইনিসিয়াল, তাই দিয়েই চিনবে তাঁকে ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষিত পরিবার। ভারতবর্ষের বাইরে বললে, শ্রদ্ধায় নত করবে

মাথা। মানসিক রোগের অমানুষিক যন্ত্রণায় সব চেয়ে গোড়ায় যাঁদের নাম মনে আসে, ডাক্তার তাঁদের অন্যতম নয়, বিশিষ্টতম।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবো তার ঠিক ছিল না, এলোমেলো ঘুরতে লাগলাম। ডাক্তার এই এলোমেলো ঘোরার চিন্তা থেকেই কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণ নিশ্চয়ই বার করতেন। সেই কথা মনে হতেই আরো যে কথা মনে হ'ল তা হচ্ছে, পাগলের ডাক্তারী করতে ক'রতে ডাক্তারই না পাগল হ'য়ে যায় শেষে। এখন 'পাগলে' পেয়েছে যাকে, পাগলামীতে পেতেই বা তাঁর কতক্ষণ। চোর-ডাকাত-খুনের পেছন পেছন সারাজীবন ঘুরে পুলিশের নিজেরই চোর-ডাকাত হবার ঘটনা বিরল, একেবারেই ঘটেনি, এমন ত নয়।

ডাক্তারের সঙ্গে আমার আলাপ ক'দিনেরই বা? মানুষের মন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রতে হয় ডাক্তারকে সারাদিন—এ তাঁর পেশা। কিন্তু আমি কিসের টানে আসি এখানে?—নেশা? তাই হবে। কারণ পেশার চেয়ে নেশা সব সময়ই বেশি সর্বনাশ করে। পেশা থেকে লোকে এক সময়ে মুক্তি পায়; না পেলে চায় বিরতি। কিন্তু নেশা থেকে মুক্তি নেই, বিরতি আছে, সে শুধু আবার নেশা করার জন্যেই নতুন করে!

দুরন্ত দেহ-বৈকল্যে মানুষের মৃত্যু কামনা দেখেছি, দারুণ দারিদ্র্যে সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসেও প্রতিমুহূর্তে আশা করার এবং আশা ভঙ্গের শুনেছি মর্মন্তুদ বিলাপ, ফটকার বাজারে দিনের ফকিরের রাতে রাজা হ'বার, আর রাত ফুরবার আগেই ওই ফটকায় সবই দিয়ে, এক রাতের মধ্যে ঘন কালো চুলকে তুলোর মত সাদা ক'রে ফেলার কাহিনী পড়েছি বইতে। কিন্তু বেঁচে থেকে গোটা একটা মানুষ সম্পূর্ণ মৃত, সৃষ্টিকে নিয়ে স্রষ্টার এতবড় পরিহাস, 'পাগলদের চেয়ে বড় ট্রাজেডী কল্পনা করাও অসম্ভব।'

কিন্তু সে সবকথা মনে এলেও এখন তোলা থাক। কারণ

সেই বিচিত্র মনরোগের বিচিত্রতর কেসগুলিই এই উপাখ্যানের মুল উপাদান। যথাস্থানে, যথাসময়ে পাঠকের সামনে হবে তার একটু একটু করে উন্মোচন। এখন যাঁকে না হলে জানতাম না এসব কিছুই, উন্মাদ বলে করতাম পরিহাস, মানুষের ভালোবাসার, আশার আর আলোর প্রয়োজন যাদের সব চেয়ে বেশি; দূরে ঠেলতাম তাদের যাঁর কাছে না গেলে, এই কাহিনীর মূল গায়েন হলেন সেই ডাক্তার, আমি শুধু অনুলেখক মাত্র। তাঁর সঙ্গে কেমন ক'রে হ'ল আলাপ তাই দিয়েই আরম্ভ হ'ক, এই উপন্যাসের চেয়ে অলৌকিক জীবন-পঞ্জীর ধারা-বিবরণী। এ বিবরণ অলৌকিক, কিন্তু অলীক নয়। সত্য এবং নির্মম।

কোন কোন সন্ধ্যা বা সকাল সকাল সকলের জীবনেই যেমন হয়, তেমনি একটি সন্ধ্যার কথাই বলছি—একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা,—দশ বছর আগের। গানের ঘরোয়া জলসায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল একজন। তখন খুসী হইনি, আজ তার কাছে কৃতজ্ঞ। ছোট্ট ঘরটি পরিপাটি সাজানো। গানের আবহাওয়া আনবার জন্যেই সবুজ আলো, ধূপের গন্ধ। সেই গোধূলি পরিবেশে দেখলাম একজন প্রৌঢ়কে; চুলের শুভ্রতায়, হাসির উচ্ছলতায়, চোখের উজ্জ্বলতায় বিশিষ্ট সেই মানুষটির পরিচয় নিতে হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই। যাঁর নাম শুনলাম, এ কাহিনী সুরু করেছি তাঁকে দিয়েই। সুন্দর চেহারার চেয়ে সৌম্যমূর্তির বেশি আকর্ষণ, এর আগে তা কে জানতো। একাধিক গান হলেও একজন গায়ক। এ-গান, সে গানের পর স্মিত হেসে সেই সৌম্যমূর্তি বিশিষ্ট শ্রোতাটি অনুরোধ জানালেন একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের। জেনে কি না জেনে, জানি না, গায়ক আরম্ভ করলেন:

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে,
বলে শুধু বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল! চোখের উজ্জ্বলতা এলো কমে। সৌম্য

শান্ত সেই প্রশান্তবদন প্রৌঢ়ের দু'টি চোখ ছলছল করতে লাগল। সুরের উত্তাপে জ্ঞানের জমাট তুষার গলতে লাগল। কান্নায় ভেসে গেল সব। হাসিতে যাঁকে মনে হয়েছিল অপূর্ব, কাঁদতে তাঁকে মনে হল অপরূপ। সেই প্রথম অনুভব করলাম, হাসিতে মুক্তো ঝরে, কিন্তু কান্নায় ফোটে ফুল। হাসিতে আলো জ্বলে, কান্নায় বাজে বাঁশি। বাইরের থেকে দেখলে ওপর ওপর মনে হয় হাসি, কিন্তু যে হাসির তলায় নেই কান্না, সে হাসি মিথ্যে, সে হাসি হাস্যকর!

সেই প্রথম। তারপর শুধু পুনরাবৃত্তি! দশ বছর ধরে প্রৌঢ়ের কাছে যাচ্ছি। প্রৌঢ় বৃদ্ধ হয়েছেন, যুবক হয়েছে প্রায় প্রৌঢ়। প্রতিমুহূর্তে তবু মনে হচ্ছে এখনও অনেক পাওয়ার আছে প্রৌঢ়ের কাছ থেকে। মানুষের মনের রাজপথে মাত্র এসে পৌঁছেচে জ্ঞানের সূর্যালোক। তার মনের অন্ধ আর চোরাগলিতে জ্বালিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই আলো-কে। তবেই মুক্তি, তবেই অব্যাহতি।

আমরা প্রায়ই বলি, 'পাগলে কী না বলে…'; আমরা জানি না তাই ও-কথা বলি। জানলে বলতে পারতাম, বহু পাগল আছে যারা কিছুই বলে না। না বলাই তাদের একমাত্র মানসিক রোগের প্রমাণ।

ডাক্তার সেই কথাই বলছিলেন একদিন। দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা আমি। আমাকে ডাক্তার একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন: 'আচ্ছা ল্যান্সডাউন রোড যেখানে মনোহরপুকুর রোডকে ফেঁড়ে গেছে সেখানে, তোমার কী মনে পড়ে এমন কোন লোককে দেখেছ, রোজ রাস্তার একজায়গায় দাঁড়িয়ে কোন কথা বলে না, শুধু কাঁদে—, মনে পড়ে তোমার?'

'হ্যাঁ,' 'হ্যাঁ'—অতীতের অন্ধকারে স্মৃতির সার্চলাইট পড়ে। বলি, লোকটার হাতে একটা—?'

'ঠিক বলেছ', ডাক্তার খুসী হয়ে ওঠেন। ঠিক, লোকটার হাতে

একটা মস্ত বড় পাঁউরুটি থাকত। যাক্, যেকথা বলছিলাম, লোকটাকে তোমার মত আরও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক দেখেছে, কিন্তু লক্ষ্য করেনি। পাগল ভেবে চলে গেছে। কিন্তু কেউ খোঁজ করেনি ঐ কান্নায় ভেজা রুটির ইতিহাস, করলে—'

'করলে ?'—আমার রুদ্ধশ্বাস জিজ্ঞাসার জবাবে ডাক্তার হাসেন। বাড়িয়ে দেন ডায়েরী। বলেন: 'এটা পড় আগে, লোকটার কেস সম্পূর্ণ রয়েছে এই ডায়েরীতে।'

মস্ত বড় মনোহরপুকুর রোডে সেদিন মনোহরণ করবার মত প্রায় কিছুই ছিল না। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান ছিলো তারই মধ্যে, নেবুদার মনোহারী দোকান। সকাল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সে জায়গায় সমান ভীড়। দোকানের সামনে দু'খানা লম্বা বেঞ্চিতে যারা আগে এসে জায়গা নিত তারা ভাগ্যবান। বাকীরা দাঁড়িয়ে পায়চারী করে, একটু দূরের দোকান থেকে চা আনিয়ে, খবর কাগজখানা ভাগ ভাগ করে, আগাপাস্তোলা পড়ে যখন বিদায় নিতো তখন বিকেল আরম্ভ হ'তে দেরী নেই বেশি। আর সন্ধ্যে হ'তে না হতে আসর নিত তারাই।

ঘন চুলের কাঠিন্যে যখন চিরুনী ভেঙ্গে যাবার কথা তখন থেকেই একমাথা টাকে, কপালের কুঞ্চিত রেখায়, কয়েকটি দাঁতের অভাবে পঁয়ত্রিশের এ-প্রান্তেই যাকে প্রৌঢ় বলে মনে হ'ত সেই নেবুদা মনোহরপুকুর রোড আর তার আশপাশের সকলেরই নেবুদা। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সববায়ের সমান প্রিয়। বাপ যাকে 'নেবুদা' বলছে ছেলেরও সে নেবুদা-ই। জন্মেই জ্যাঠা হওয়া শক্ত, নেবুদার ভাগ্য করেছে সেই অসাধ্য সাধন।

নেবুদার একফালি, সেই একরত্তি দোকানে কী মধু ছিলো কে জানে সেখানে যারা আসত তারা শুধু খদ্দেরই নয়, তারা মৌমাছিরই

মত আটকে যেত। নেবুদার মনোহারী দোকান সেই ব্যূহের মত যেখানে অভিমন্যুদের ঢোকবার পথ জানা ছিল কিন্তু বেরুবার রাস্তা নয়।

নেবুদার মনোহারী দোকান বন্ধ হ'ত রবিবার দু'টায়, খুলত সোমবার সকালে। রবিবারের সন্ধ্যেটাই মাটি হত সক্কলের। কোন দিন যদি দৈবাৎ বন্ধ থাকে খবর কাগজ, তাহলে যেমন আজকের বার্তাভূক মানুষদের হাল, তেমনি হত রবিবার সন্ধ্যেয় নেবুদার খদ্দেরদের। তারা যেন অসহায় বোধ করত, রবিবারের রাত আর কাটবে না এমন দুস্তর মনে হত সেই ক'ঘণ্টা।

সেই নেবুদার মনোহারী দোকানে আসত ফুটফুটে একটা মেয়ে। আট বছরের সেই মেয়েটি যেমন দুষ্টু, তেমনি মিষ্টি—মেয়ের নাম ছিল সুর্মা। জগৎ শুদ্ধ যত লোকের মনোহরণ করবার মত একখানা মুখ নিয়েই জন্মেছিল মেয়েটি! পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দোকানটা তচনচ করে ফেলত। রেগে কখন-কখন নেবুদা যদি বলত, 'ফের ?' ব্যস। মেয়েটার চোখ ছলছল করবার আগেই নেবুদা ব্যতিব্যস্ত। 'আহা-হা আমি কি রাগ করে বলেছি, ঠাট্টা বোঝ না এতবড় মেয়ে ?' এক চোখে কান্না মুছে নিয়ে আরেক চোখে হাসত সুর্মা। বৃষ্টিধরা আকাশে রং ধরত যেন রামধনুর।

সুর্মার সবচেয়ে বড় সখ ছিলো ফাউ নেবার। চার পয়সায় আটটা লজেন্স, তার চাই নটা। বাবার জন্যে দু'পয়সার নস্যি নিতে এসেও তার নিজের জন্যে একটা পেপারমেণ্ট ফাউ। নেবুদাও 'না' করত না, করলেও লাভ হত না। সুর্মা-কে 'না' বলা অসম্ভব।

কিন্তু একদিন গোলমাল হ'য়ে গেল একটু। সুর্মা কি যেন কিনতে এসে বায়না ধরল একটা আস্ত পাঁউরুটি তার ফাউ চাই। বেঁকে বসল নেবুদা। নেবুদা দেবে না ; না নিয়ে ছাড়বে না সুর্মা।

প্রথম প্রথম ভাবছিল শেষ অবধি নেবুদাকে হার মানতেই হবে। হাতে পাঁউরুটিটা তুলেও নিয়েছিল মেয়েটা। কিন্তু নেবুদা সেটা ফস করে কেড়ে নিতেই ঝরঝর করে কান্না নামল সুর্মার দু'চোখ বেয়ে। চলে গেল সে। এই প্রথম গেল ফাউ না নিয়ে।

একদিন গেল, দুদিন, তৃতীয়-চতুর্থ দিনেও আর এলো না সুর্মা। রবিবার সন্ধ্যেয় নেবুদা নিজেই গেল সুর্মার বাড়ি। সুর্মার মান ভাঙ্গাতে রুটিটা হাতে করে নিয়েই গেল।

দরজার কড়া নাড়তেই যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি বোধ হয় সুর্মার মা। নেবুদার তাঁকে দেখেই মনে হ'ল, হ্যাঁ, সুর্মা এঁরই মেয়ে হওয়ার মত বটে।

'সুর্মা আছে ?'—নেবুদার গলায় ছটফট করার সুর।

মাথা নাড়িয়ে জবাব দেন সেই মহিলা, 'না'।

'কোথায় গেছে ?'

এবারে তিনি কিছু বলবার আগেই ভেতর থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে তাঁকে বলল : 'মা তুমি ভেতরে যাও।'

ছেলেটিকে নেবুদা জিজ্ঞেস করেন : 'সুর্মা কোথায় গেছে ?'

'মারা গেছে।'

'মারা গেছে ?'

'হ্যাঁ, ম্যানেনজাইটিসে।'

'ও !'

ছেলেটি একটু বাদে জিজ্ঞেস করে : আপনিই কি সুর্মার নেবুদা ?'

'হ্যাঁ।'

'রুটি ফাউ-র জন্যে বায়না ধরেছিল সুর্মা ?'

'হ্যাঁ, কেন ?'

"প্রলাপের ঘোরে বলছিল, 'আর কোনদিন ফাউ চাইব না, বোকো না নেবুদা'—"

তার পরেরদিন সোমবার সকালে নেবুদার মনোহারী দোকান খুলল না। তার পরের দিনও নয়। শুধু একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দোকানের সামনে, হাতে একখানা রুটি নিয়ে।

লোকে আস্তে আস্তে ভুলে গেল তার নাম। সবাই জানল শুধু লোকটা পাগল।

'কেস ডায়েরী এখানেই শেষ?' আমার প্রশ্ন শুনে ডাক্তার বল্লেন, 'না, এখানেই শুরু! এবারে আরেকটা পড়'—

দুই

আরেকটা পড়'—, বলে ডাক্তার কিস্তু আমার হাত থেকে কেস-ডায়েরীটা কেড়ে নিলেন। যেকথাটা মনে উঠে মনেই মিলিয়ে গেল, সে-কথাটাও ডাক্তার কেমন করে যেন শুনতে পেলেন। হাসতে হাসতে বল্লেন ঃ 'কী ? ভাবছ, পড়তে বলে যে পড়বার জিনিষ কেড়ে নেয়, সে আবার পাগলের ডাক্তার কোথায় ? সেত' নিজেই পাগল !' —আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার হাসেন,—'কী ভাবছ এখনও ? আমারই চিকিৎসা দরকার ?—Doctor heal thyself, —এই ত ?'

যেটুকু বুঝলাম, তা' হচ্ছে ডাক্তারের হাতে এখন কাজ নেই। বাইরের দিকে তাকালাম। ডিসেম্বরের আকাশ আশ্চর্য নীল ! সেই আকাশকে মাঝ-সমুদ্রের মত মনে হয়। আর সেই নীলাম্বুরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় আলোর শুধু রূপ নেই, তার বোধ হয় একটা একটানা স্বরও আছে। ঢেউ-এর সাদা ফেনার মত ডিসেম্বরের নীল আকাশ থেকে উৎক্ষিপ্ত রৌদ্রালোককে মনে হয় অমনই ফেনিল। মনে হয় সমুদ্রের সেই ঢেউ-এর মতই পৃথিবীর-পাড়ে লেগে আলোর ঢেউ ভেঙ্গে যাচ্ছে টুকরো-টুকরো হয়ে, আবার আসছে, আবার ভাঙ্গছে। সেই নরম রোদ্দুরে রোমাঞ্চিত হয় শরীর। বিপুল আনন্দে আকুল হয় মন। উধাও হয় উদ্দাম-বেগে কল্পনার তুরঙ্গে দিগ্বিজয়ের সওয়ার হ'তে ; পৃথিবী পড়ে থাকে পায়ের-তলায়, নীল-দিগন্ত,—হাতের মুঠোয়। এই মুহূর্তে জীবনটাকে মনে হয় জীবনানন্দের নিটোল এক কবিতা।

ডাক্তার এবারে, এতক্ষণে ব্যক্ত করেন নিজেকে ; স্পষ্ট করেন নিজেকে ; বলেন ঃ 'না-হে, এমনি কেড়ে নিইনি কেস-ডায়েরী ; কথা আছে পড়বার আগে। কেস-ডায়েরী ত' তোমার হাতের কাছেই

রইল, যখন খুসী পারবে পড়তে। যতবার খুসী। পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগবে। তার চেয়ে ওতে বিরতি দাও একটুকাল। সেই সময়টা শোন একটা ঘটনা যার উল্লেখ নেই ওই ডায়েরীতে, শুধু তাই নয়, তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুও নেই যেটা পড়বার জন্যে তুমি ব্যগ্র, তা'তে। এ-ঘটনা কিন্তু শোনা-গপ্‌পো নয়। এ-ও আমার প্রত্যক্ষ। নিজের চোখে দেখা ; তবুও এত বছর বাদে, এত পাগল নিয়ে এত রকম অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার পরেও আমার নিজেরই এক-এক সময়ে মনে হয়, যা দেখেছিলাম, তা' ঠিক নয় ; চোখের ভুল।'

নড়ে-চড়ে বসলাম। বলে কী ডাক্তার ! এই ডায়েরীর বাইরেও তাহলে ছড়িয়ে আছে আরও অবিশ্বাস্য, অলৌকিক, আরও মর্মন্তুদ জীবন-নাট্যের ট্রাজেডী। ভারতে এমন ঘটনাও তাহলে আছে, যাহা নাই মহাভারতে। আশ্চর্য !

—'না, আশ্চর্য নয়। আশ্চর্য ছাড়া মানুষের ব্যাপারে আর সব কিছু হওয়া চলে। মানুষের জীবনেই শুধু এমন ঘটনা ঘটে যাতে চরম বিস্ময়ের পরেও আছে পরমাশ্চর্য মুহূর্ত। পরমাশ্চর্যের পরেও আছে পলক না পড়বার মত অভিজ্ঞতা।'—ডাক্তার এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নেন। তারপর ধরান পাইপ। তারপর বলেন ঃ 'একটু বোস ; আমি ভেতর থেকে আসছি একবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এসে বলছি তোমাকে সেই ঘটনা।'

ডাক্তার ভেতরে গেলেন, ভারি পর্দা ঠেলে।

আমি ধরালাম আর একটা সিগ্রেট। তার ধোঁয়ায় জ্বলে উঠল ডাক্তারেরই একটা অমূল্য উপদেশ। ডাক্তার একদিন বলেছিলেন যে, আমরা যে-মন নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাই, জাদুঘর দেখে আসি, ম্যাজিকের আসরে ঢুকি, তেমনি কৌতূহল নিয়ে যাই রাঁচীর পাগলা-গারদে ; লুম্বিনী পার্কে ; অথবা আর কোনও মানসিক রোগের আরোগ্য নিকেতনে। যাদের জন্যে করুণা হওয়া উচিত, তাদের

দেখে হয় কৌতূহল। আমরা পাগল দেখে হাসি ; অথচ ভেবে দেখি না কখনই, ভেবে দেখবার ক্ষমতাই আজকে হারিয়েছি বলে যে, আমরা যারা সমাজের রঙ্গমঞ্চে ভদ্রতার মুখোস পরে মিহি-গলায় নক্কারজনক আলাপে মুগ্ধ করে রাখছি তাকেই যার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত আমরাই ; বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি যাকে, তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কটূক্তি করলে কেউ, তা গলাধঃকরণ করছি চপ-কাটলেটের মতই মুখরোচক খাবার মুখে-তোলার চেয়েও বেশি আগ্রহে ; সেই আমরা হচ্ছি সেয়ানা-পাগল ; আর ওরা সত্যি পাগল ; তফাৎ শুধু এই মাত্র !

ডাক্তার আরও বলেছিলেন যে, যারা পুরো পাগল হয়ে গেছে তাদেরই সগোত্র মনে করে আরোগ্যের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, এমন লোককেও শুধু ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে তাকে উন্মাদ না করা পর্যন্ত আমরা নিরস্ত হতে চাই না কিছুতেই। ডাক্তারের কথার প্রতিবাদ করতে পারিনি। আমারই পাড়ায় মা'র একমাত্র সন্তান একটি কিশোর, যার সব সহ্য হত, কিন্তু মাথায় কোন টোকা দিলেই সে ক্ষেপে যেত, তার এই দুর্বলতা যেদিন জানাজানি হল, সেদিন থেকেই সুরু হল তার মাথায় চাঁটি মারা। ছেলেটা ক্ষেপে যেত ; তারপর কাঁদত। সেই কান্না হাসির রোল তুলত পাড়ার সব যুবকদের মধ্যে। তারপর একদিন সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হল। যুবকদের মজা এল কমে। পাগল হয়ে গেল কিশোর। মনস্কামনা পূর্ণ হল আমাদের পাড়ার। এমন অনায়াস-সাফল্যের কথা ভাবেনি তারা। তার পাগল হয়ে যাবার গল্প করতে করতে গর্বে ফুলে উঠত শিক্ষিত যুবকরা।

হাজার হাজার বছরের মানুষের ইতিহাস এই কথাই বলে যে মানুষের বুদ্ধিকে মানুষ যতখানি ব্যঙ্গ করেছে তার নিজের কাজ দিয়ে, এতখানি আর কিছুকে নয় ; সভ্যতার তথাকথিত জয়যাত্রা প্রাগৈতিহাসিক পরবর্তী দিন থেকে কেবলই ঘোষণা করছে নিজের

পরাজয়বার্তা; সভ্যতার যুগে আমরা যত হৃদয়হীন হয়েছি, এত নির্দয়-নির্মম আমরা অসভ্য ছিলাম যখন তখনও ছিলাম না। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডিয়ান চার্লি চ্যাপলিনের কথায় তারই প্রতিধ্বনি: "In this age of scientific inventions, we THINK too much, we FEEL too little!"

ভাবতে ভাবতে সিগারেট এসে গেছে আঙুলের ডগায়। ফেলে দিয়ে বসতে না বসতেই এসে গেছেন ডাক্তার নিজের চেয়ারে। নিভে যাওয়া পাইপ-টা আবার ধরিয়ে নিয়ে বাইরের লনে গিয়ে বসলেন আমাকে নিয়ে। চেয়ার পাতা ছিল সেখানে; চেয়ারের ওপর ছিল গরম চা। গলানো সোনার মত টলটলে। সুন্দরী মেয়ের ঠোঁটের মত পাতলা পেয়ালার গা। চা নয় কিছু, চায়ের পাত্রের ওপরই নির্ভর করে চাওয়া। যেমন নাকি গান; স্বরের ওপর জোর নয় ততটা, যতটা জোর গলার সুরে।

লনের সবুজে এসে পড়েছে দিনের শেষ সূর্যের সোনা। নানা রং-এর ফুলে সূর্যের রং পড়ে জ্বালিয়েছে আলোর রং-মশাল। বিচিত্র বর্ণসমারোহের সঙ্গে হয়েছে গন্ধের আলিঙ্গন। কত ফুলের কত রকম গন্ধ! রং-এর সঙ্গে গন্ধের সেই অশ্রুত সিম্ফনির সামনে যখন চুপ করে বসে থাকতেই ভাল লাগে, তখন ডাক্তারের কাহিনী এ্যান্টিক্লাইম্যাক্স হবে জেনেও আমি কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে পারলাম কই?

ডাক্তার আরম্ভ করলেন:

তুমি জানো সিনেমা দেখতে সচরাচর আমি যাই না। ক্বচিৎ কালে-ভদ্রে কারুর এড়াতে না পারা পাল্লায় পড়লে তবেই কয়েক বছরে হয়ত এক কি দু'বার আমার দেখা হয় ফিলম্। কারণ আমার চোখের ওপরই যেসব ঘটনা রোজ ঘটে সিনেমা-থিয়েটারের তুলনা হয় না তার সঙ্গে। সকাল থেকে সন্ধ্যে রোজই আমার চেম্বারে নতুন নতুন সিনেমা। তার কোনটার সঙ্গে কোনটার নেই মিল। এমন ভ্যারাইটি শো শহরের কোথায় হয় বল?

সেই আমি একবার কয়েক বছর আগে মেট্রোতে ম্যাটিনি শো'তে গিয়েছিলাম একেবারে একা। কী ছবি দেখতে, তা' মনে নেই। মনে থাকবার মত কথাও নয়, কারণ ছবি দেখতেই যাইনি। গিয়েছিলাম মেট্রোর ওই ঠাণ্ডা-পরিবেশে হাত-পা মেলে একটু বিশ্রাম উপভোগ করতে। আমাদের দেশী হাউসে আর যাই থাক প্রমোদ পরিবেশনের পরিবেশ নেই মোটেই। যখনকার কথা বলছি তখন ত' ছিলই না মোটে। মেট্রোতে ভালো ছবি না হলেও সব সময় গিয়ে বসে থাকতেও ভালো লাগত। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন গিয়েছিলাম মেট্রোতে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হল সেদিন।

যখন ঢুকলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে অডিটরিয়েম। ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে একটু আগেই। চোখটা ধাতস্থ হ'তে তাকিয়ে দেখলাম আশ-পাশ। খুব সাংঘাতিক ভীড় হয়নি। অনেক সীটই শূন্য। বুঝলাম, ছবিটি ভালো। অন্ধকারে ইতস্ততঃ সিগারেটের-মুখে আগুন। জ্বলছে, নিভছে, বাড়ছে, কমছে। স্থির হয়ে বসা অসংখ্য জোনাকি যেন। তখনও সিনেমা-হলে সিগারেট খেতে দিত; এখন সিগারেটের স্লাইড দিতে দেয়; সিগারেট খেতে দেয় না ঘরের মধ্যে!

একটু পরেই শুনলাম, আমার ঠিক সামনে-বসা এক ভদ্রলোক তাঁর পাশের ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করেছেন ঃ 'আমাকে কিছু বলছেন?' ভদ্রমহিলার ঠিক পেছনে আমার সীট, ভদ্রলোকের সীট তার পাশেই। ভদ্রলোকটির মুখের ধারটুকু দেখা যাচ্ছিল; কিন্তু ভদ্রমহিলার নয়। কিন্তু মাথা নেড়ে তিনি যে জবাব করলেন, 'না' সেটুকু বোঝা গেল সহজেই।

প্রথমে কিছুই মনে হয়নি; কিন্তু একটু বাদে মনে না করে আর উপায় রইল না। কারণ ফের যখন দেখি ভদ্রলোক আবার সেই প্রশ্ন করছেন ঃ 'আমাকে কিছু বলছেন?' এবং ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে বলছেন 'না'। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, পনের মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোক

আরও বেশ কয়েকবার সেই একই কথা জিজ্ঞেস করেন; আর ভদ্রমহিলার মাথা ঝাঁকি দিয়ে একই জবাব: 'না'।

যে সন্দেহ প্রথমেই ডাক দিল, তা হচ্ছে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ছিটগ্রস্ত এবং ভদ্রমহিলার কথা ভেবে ভয় পেলাম। মহিলারা মন্তপের পাশে বসতে সঙ্কুচিত হন, পাগলের পাশে বসতে নিশ্চয়ই তার চেয়ে ঢের বেশি হন আতঙ্কিত। একটু বাদে ইনটারভ্যাল হ'তে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলেন। আমিও। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

বাইরের লাউঞ্জে ভালো করে দেখলাম ভদ্রলোককে। সুবেশ। সুপুরুষ। অত্যন্ত অল্প বয়স। দীর্ঘ দেহ। তারুণ্যের লাবণ্যে কিশোরীর মত ঢলঢলে মুখের ওপর ছলছল করছে দুটো চোখ; অত্যন্ত স্বাভাবিক। কার সঙ্গে ইংরেজী আলাপ করলেন। সুন্দর কণ্ঠস্বর; শোভন উচ্চারণ; কথা বলবার কায়দায় মনে হল এর পেছনে আছে অনেক দিনের প্রস্তুতি। কথা বলতে বলতে হাসলেন; হাসি শুধু স্বাভাবিক নয় মার্জিত। কালো স্যুটে গৌরবর্ণ ফেটে পড়তে চাইছে। সাদা সার্টের ওপর ছাই রং-এর টাই। কোটের বুক পকেটে কলমের সোনালি খাপের পেছনে সাদা রুমালের কোণা; জুতো খয়েরী; পালিশে পালিশে মুখ দেখতে পাবার মত দর্পণ-স্বচ্ছ। কোঁকড়ানো কালো চুল চকচকে ক্রীমের কল্যাণে চমকাচ্ছে আলো পড়লে। পাতলা ঠোঁটের ওপর নাকটা যতটা তীক্ষ্ণ হলে চেহারায় আসত আরও ইনটেলেকচুয়াল দীপ্তি, তার চেয়ে নাকটা একটু মোটা; কিন্তু তাতে চেহারাটাকে করেছে আরও—। হাতের ঘড়িটার আকৃতিতে বৈশিষ্ট্য আছে; ব্যাণ্ডটা প্লাষ্টিকের সাদা। চিবুক এবং পাতলা ঠোঁটের মাঝখানে বাঁ-দিকে তিল আছে একটা ছোট। গোঁফটা দুদিক ছাটা, মাঝখানটা ভেতরে ঢোকান অনেকটা ডানার মত দেখতে। সিগারেট কেশ থেকে একটা সিগারেট বের করে ভদ্রলোক যতক্ষণ খেলেন, ততক্ষণ খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে সব দেখলাম। তন্ন তন্ন করে ; খানাতল্লাসীর চোখ দিয়ে। কোথাও পাগলামীর লক্ষণই দূরে থাক, ত্রুটি দেখলাম না এতটুকু। আশ্চর্য !

ইনটারভ্যাল শেষ হল ; আলো নিভে গেল আবার। সীটে এসে বসলাম। ছবি সুরু হল ফের। কিন্তু শুধু ছবি সুরু হলে ছিল ভালো। ছবি সুরু হবার একটু বাদেই আরম্ভ হল ভদ্রলোকের সেই পাগলামী। পাগলামী মানে আর কিছু নয় ; সেই প্রশ্ন ঃ 'আমাকে কিছু বলছেন ?' ভদ্রমহিলারও সেই মাথা নেড়ে উত্তর ঃ 'না'। এবারে প্রশ্নোত্তর হতে লাগল ঘন ঘন।

ভাবলাম ইণ্টারভ্যালের সময়ে বাইরে না গিয়ে ভদ্রমহিলাকে সীটটা দিয়ে দিলে আমার যাই হক ভদ্রমহিলা বাঁচতেন। কিন্তু এখন ? ক্রমশঃই ভদ্রলোক শুধু আমার নয়, এর-ওর, আর আর অনেকেরই কর্ণ আকর্ষণ করলেন প্রথম, তারপর দৃষ্টি !

সে এক বিশ্রী ব্যাপার। প্রতি মুহূর্তে ভয় হয় বুঝি আলো জ্বেলে, লোক ডেকে, সীন হয় একটা অডিটরিয়মের মধ্যেই ! কিন্তু তা' হল না। 'সময়'ই ঠিক সময়ে রক্ষে করল। ছোট ছবি শেষ হয়ে গেলে এরই মধ্যে !

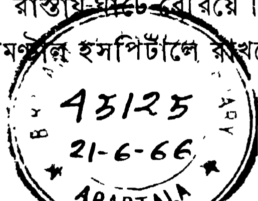
সবাই বেরিয়ে গেল। শুধু সেই মহিলা ছাড়া। বুঝলাম ভদ্রলোক কাছাকাছি নেই, এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে তবেই নিষ্ক্রান্ত হবেন তিনি। কাজেই আমিও হল ত্যাগ করে এগুলাম ট্রামের দিকে। এসপ্ল্যানেড গুমটির ভেতরে ঢুকে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি সেই ভদ্রলোক। তেমনি স্বাভাবিক, তেমনি চোখে পড়বার মত বিশিষ্ট। দু'জনে একই ট্রামে উঠলাম। ফাষ্ট ক্লাসের পেছন দিকে অর্থাৎ সেকেণ্ড ক্লাসের গায়ে যে অংশটা, সেইখানে বসলাম দু'জনে ; কোনও কথা নেই। কিন্তু ট্রামের ঘণ্টা দিয়েও চলবার কোন চেষ্টা নেই। বেশ একটু বাদে ট্রাম যখন চলবার জন্যে নড়েচড়ে উঠেছে সেই মুহূর্তেই সর্বনাশ হ'ল। দেখি সেই ভদ্রমহিলা এসে আমাদের সেই

ট্রামেই উঠলেন; কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা লেডিস সীটে; বুঝলাম ভদ্রমহিলা ভাবতে পারেন নি যে সেই ভদ্রলোক এতক্ষণ চৌরঙ্গীর চৌহদ্দীর মধ্যেই আছেন। ভাবতে পারলে নিশ্চয়ই ট্রামে ওঠবার আগে ট্রামের ভেতরটা একবার দেখে নিতেনই। ভদ্রলোকের দিকে লক্ষ্য কোরলাম। কোন ভাব-পরিবর্তনও লক্ষ্য কোরলাম না। তেমনি নির্বিকার !

হাজরার মোড়ে এসে সেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আমিও রাস্তায় পা দেবার মুহূর্তে দেখলাম ভদ্রমহিলাও উঠছেন সীট ছেড়ে। মনে মনে বল্লাম: 'নাটক তাহলে নিশ্চয়ই জমছে; আচ্ছা দেখা যাক তবে!' নেমে কয়েক পা যেতে না যেতেই মেট্রোর সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ভদ্রলোক ফের জিজ্ঞেস করেছেন: 'আমাকে কিছু বলছেন?' এবং ভদ্রমহিলার সেই মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব: 'না'! কিন্তু হাজরার মোড়, মেট্রো সিনেমার অডিটরিয়েম নয়। দেখতে দেখতে জমে গেল লোক। ঘিরে দাঁড়াল ভদ্রলোককে।

মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। ভদ্রলোককে বদমায়েস মনে করে মেরে ফেলবে। অথচ ব্যাপারটা জানি শুধু আমি। আর চুপ করে থাকা যায় না; 'ভদ্রলোক বদ্ধ পাগল; ওঁর গায়ে হাত দেবেন না, ছেড়ে দিন;'—এই কথা বলতে যাব, এমন সময়ে ব্রেক করে গাড়ী দাঁড়াল একখানা; সাদা ঝকঝকে অত বড় গাড়ী কলকাতায় খুব বেশি দেখা যায় না।

তিন চারজন লোক তার থেকে নেমে এসেই পাঁজাকোলা করে প্রায় তুলে নিয়ে গেল সেই ভদ্রমহিলাকে গাড়ীর মধ্যে। একজন চীৎকার করে বলছে গাড়ীর মধ্যে শুনলাম: 'আবার তুমি রাস্তায় বেরিয়েছ?—চল, বাড়িতে; এবারে হাসপাতালে দিয়ে আর নিয়ে আসব না।' আরেক ভদ্রলোক ভীড়ের মধ্যে এসে ভদ্রলোকের হাত ধরে বল্লেন: 'কিছু মনে করবেন না; ও আমার বোন, একদম পাগল; মাঝে মাঝে রাস্তায়-ঘাটে বেরিয়ে গিয়ে এমনি বিপদ করে; অথচ একমাত্র বোন, মেণ্টাল হসপিটালে রাখতে বড় কষ্ট হয়।'



ভীড় পাতলা হয়ে এল। দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু আমরা দু'জন। সেই ভদ্রলোক আর আমি ; আমার মুখ দিয়ে কখন আমার অজান্তেই বেরিয়ে গেছে ঃ 'তাজ্জব'।

ভদ্রলোক আমার কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে বসেছেন ঃ 'আমাকে কিছু বলছেন ?'—প্রশ্ন শুনে মেট্রোর ভেতরকার দৃশ্য ভেসে উঠেছে আমার চোখে' ; একটা প্রবল অট্টহাসি কী করে জানি না সংবরণ করে কোন রকমে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলেছি, 'না ;' তারপরে চট করে ঢুকে পড়েছি, সামনে যে গলি পেয়েছি তার মধ্যেই !

ডাক্তারের গল্প শেষ হ'ল। সেই সঙ্গে শেষ হল একটি বিচিত্র বৈকাল !

তিন

পাগল হয়ে গেছে যে, তার কাছে রূপের আকর্ষণ নেই ; নেই রূপোর প্রলোভন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, হয় রূপ, নয় রূপো, মানুষ পাগল হয়েছে আবার, এরই জন্যে চিরকাল। জীবনের ট্রাজেডীই হয়ত এই ; যার জন্যে পাগল হওয়া, পাগল হয়ে আর তার জন্যে নেই এতটুকু অস্থিরতা। সাধকরাও তপস্যাচ্যুত হয়েছেন মৃগনয়নার কটাক্ষে ; আদর্শ হার মেনেছে বারবার ; প্রলোভনের আলেয়ায় পতঙ্গের মত গিয়ে পড়েছে ঝাঁপিয়ে ; ফেরার পথ খুঁজে পায়নি আর। যতবার স্বর্গলোকে ইন্দ্রের আসন হয়েছে চঞ্চল ; যতবার তপস্যারত কাউকে দেখে স্বর্গরাজ আসনচ্যুত হবার করেছেন আশঙ্কা ; ততবার ইন্দ্রিয়-দুর্বলতার সুযোগ নিতে চেয়েছেন ইন্দ্র। বায়ু-বরুণ নয় ; নয় অগ্নি-ঐরাবত ; ধ্যানভঙ্গ করেছে উর্বশী। জিতেন্দ্রিয়কে করেছে ইন্দ্রিয়বশ ; ইন্দ্রকে করেছে নিঃশঙ্ক। কিন্তু পাগল হয়ে গেছে যে, তার কাছে ব্যর্থ উর্বশীর আবেদন ; প্রত্যাখ্যাত কুবেরের ঐশ্বর্য ! কামিনী আর কাঞ্চন, দুই-ই তার কাছে সমান অর্থহীন ! মাটি শুধু তার কাছেই টাকা ; টাকা তার কাছে মাটি !

কিন্তু এ-সব কথা শুধু সত্যিকারের পাগল সম্বন্ধেই সত্য ! সেয়ানা পাগলদের পক্ষে নয় ; শ্যামবাজার পাঁচ-মাথার মোড়ে একটি মেয়েকে দেখা যেতো রোজ বিকেলে ; গায়ে পুরনো জর্জেটের শাড়ী ; পায়ে চটি ; বিশৃঙ্খল হলেও বেশবাস আছে পুরো ; মাথার চুল কেটে দেওয়া। পাগল এই মেয়েটির অঙ্গসৌষ্ঠব চেয়ে দেখবার ; দেখে অবাক হবার ! নিজের রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ; অবহেলা-অযত্নে তার অঙ্গসজ্জা তবু অপরূপ। মেয়েটির সঙ্গে আসে একটি ছেলে, তার বাড়ির কেউ হবে ; আসে পাহারাদার হয়ে। একটি দোকানের মোড়ে এসে পৌঁছয় ; তারপর জুটে যায় আরও চার-

পাঁচজন। বোঝা যায় তারা সবাই ওই ছেলেটির ইয়ার-বন্ধু। তারা সবাই আসে রক্ষকের ছদ্মবেশে, তারপর একটু বাদেই দেখা দেয় ভক্ষক হয়ে। মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেবার ছলে যে-ব্যবহার তারা করে, তার ব্যাখ্যা যাই হ'ক—উদ্দেশ্য স্পষ্ট এবং তখন এই প্রশ্ন স্বতঃই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে, বিকারগ্রস্ত কে? জেনে-শুনে একটি অসুস্থ মেয়ের বুঝতে না পারার সুবিধে নিয়ে নিজেদের বিকৃত এবং অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার সুযোগে স্থান-কাল-পাত্র পর্যন্ত বিস্মৃত হতে পারে যারা, তাদেরই চিকিৎসা আগে দরকার, না ওই মেয়েটির? মনোবিকারে ভুগছে কে? পাগল চেনা যায়; কিন্তু সেয়ানা পাগল বাছতে যে সমাজ উজাড়!

তাই এ-প্রশ্ন না উঠে গত্যন্তর নেই; পাগল কে? পাঁচিলের ওদিকে যারা, তারা? না পাঁচিলের বাইরে আমরা যারা সমাজের চোখে ধূলো দিয়ে স্বাভাবিক মানুষের সম্মান নিয়ে ঘুরছি-ফিরছি, পাগল আমরাই? আসলে আমরা মানুষ না মুখোস? যারা আছে মানসিক চিকিৎসালয়ে, তাদের সব ঠিক থেকেও কোথায় কি একটা গোলমালের জন্যে তারা হয়েছে সমাজ থেকে নির্বাসিত; আর আমরা যাদের কিছুই ঠিক নেই, শুধু এক সেয়ানা বুদ্ধি ছাড়া, যে-বুদ্ধি কিছুই ঠিক না থাকা-কে 'সব ঠিক আছে' বলে অনায়াসে চালিয়ে দেবার রাখে ক্ষমতা, সেই আমরা রয়েছি 'মানসিক হাসপাতালের' বাইরে; আশ্চর্য!

'শুধু পাগলের ক্ষেত্রে কেন? ক্রিমিন্যালদের ক্ষেত্রেও তাই'—বলেছিলেন ডাক্তার একদিন। 'যাদের আমরা ক্রিমিন্যাল বলে চালান দিয়েছি', তারা ধরা পড়েছে বলে ক্রিমিন্যাল; আমরা ধরা পড়িনি, তাই আমরা সিটিজন। আমাদের মনের তলায় ক্রিমিন্যাল প্রবৃত্তির যে অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে, তার সন্ধান যদি বাইরে থেকে পাওয়া যেত তাহলে আমরা কেউ কি নিরাপদ বলে গণ্য হতাম কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও সমাজে?

'আমরা যারা চরিত্রবান বলে চলে যাচ্ছি',—ডাক্তার না থেমেই বলে চলেন: 'আমরা কি কেউ চরিত্রের খাতিরে চরিত্রবান? না! ভয়ে আমাদের চরিত্রবান থাকবার চেষ্টা! কেউ দেখতে বা শুনতে বা জানতে না পারলে এমন কোন অপকর্ম নেই, নেই এমন কোন অচিন্ত্য উক্তি, বা এমন কোন অসঙ্গত ব্যবহার, যার না হতে পারি আমরা নায়ক। তাই পতিতাদের সবচে'য় যিনি বড় পেট্রন, পতিতাবৃত্তি নিরোধ আন্দোলনে তাঁরই সাগ্রহ স্বাক্ষর দেখি সর্বাগ্রে, 'পতিতাদের উচ্ছেদ করো', এই আবেদন-পত্রে!

ডাক্তার একটু থামেন, তারপর সোজাসুজি আমাকে প্রশ্ন করেন; 'আচ্ছা, পাগলদের কথা বলছ, বেশ, তুমি কখনও ভেবে দেখেছ যে-কোনও সংসারে যে-কেউ যদি হঠাৎ সত্যি কথা বলতে সুরু করে, তাহলে তার অবস্থাটা কী হবে?'

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করি: 'মানে?'

'ধর, অসময়ে আমার কাছে কেউ এসে যদি বলে, "এ-সময়ে এসে আপনাকে অসুবিধেয় ফেল্লাম, না?"—তার উত্তরে আমার সামাজিক ভদ্রতাবোধ আমাকে কি জবাব দিতে বাধ্য করায়!—তখন আমাকে দিয়ে সে বলায়: না, না অসুবিধের কি আছে, বসুন, বসুন; চা খাবেন?—এই ত বলি আমরা, কিন্তু ধর কেউ যদি তা না বলে, সত্যি কথাটাই বলে, অর্থাৎ যদি কেউ বলে: 'যে, হ্যাঁ এখন এসে একটু অসুবিধেয়ই ফেল্লেন, পরে আসবেন'। —বলে দরজা বন্ধ করে দেয় মুখের উপর ত' তাকে কি বলবে? প্রথম প্রথম, অভদ্র, তারপর সবাই তাকে পাগলই বলবে। —বল ঠিক কি না?'

ডাক্তারের কথা শুনে হাসতে থাকি। ডাক্তার বলেন: 'না, হাসির কথা নয়; বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের এই বদনাম আছে। কেউ গেলে, তিনি দরজাটা আধখানা ফাঁক করে, কথার জবাব দিয়ে বাইরে থেকেই বিদায় করেন তাকে। লোকে অভদ্র বলে কিন্তু কেউ ভাবেও না একবার যে, লোকের সঙ্গে ভদ্রতার

চেয়ে তাঁর কাছে তাঁর কাজ বড়। নিজের ধর্মের প্রতি তিনি একনিষ্ঠ, —এ কি তাঁর অপরাধ ?'

দু'টো হাতের তেলোতে তেলো ঘষছেন ডাক্তার; বসতে পারছেন না একেবারে ; উঠে দাঁড়াচ্ছেন ; পায়চারী করছেন। বুঝলাম উত্তেজিত হয়েছেন। উত্তেজিত হলে ডাক্তার এই রকমই করেন। উঠে দাঁড়িয়ে, নিভে যাওয়া পাইপটাই ঠোঁটে করে ঘুরতে ঘুরতে ডাক্তার আমার সামনে সোজা এসে দাঁড়ান ; বলেন ঃ নিমন্ত্রণপত্রে আমরা লিখি, 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়'—অথচ প্রেজেণ্টেশান রাখবার টেবল এবং উপহার-দ্রব্যের তালিকা বানাবার জন্যে একজনকে দাঁড় করিয়ে তবেই আমাদের অভ্যর্থনার আদিপর্ব আরম্ভ হয়। বইয়ের সমালোচনা করি, কি বন্ধুর কাজের,—কখনও ভুলেও অপ্রিয় সত্য বলি না ; সত্য কথা বলতে আমরা ভয় পাই ; কারণ সত্য কথা শুনতেও আমরা সমান অপারগ। আজকে আমরা যারা ব্রাহ্মণ তারা ব্রাহ্মণত্বকে বুক ফুলিয়ে অস্বীকার করি, তারা উপনয়নকে কিন্তু মেনে না নিতে পথ পাই না। উপনয়নেরও কষ্টকর আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিয়ম অনেক সহজ-সুবিধের করে নিয়েছি তবুও উপনয়নের এবং উপনয়নের পরের ক'দিন অন্তত 'পৈতা' গলায় ঝোলাই, পাছে লোকে কিছু বলে। আমাদের মত স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে 'পাগল' হয়ে যাওয়াও ভালো ; তাতে পরকে এবং নিজেকে, কাউকেই করতে হয় না ছলনা !

ডাক্তারের উত্তেজনাকে আয়ত্তে আনার কথা ভাবছিলাম। চিন্তার মোড়কে ঘুরিয়ে দিতে হবে ; সবচে' সহজ হচ্ছে, পাগলের কেসের প্রসঙ্গ তোলা। এই তাঁর একমাত্র pet subject ; তাই বল্লাম ঃ আচ্ছা ডাক্তার, লোকে বলে ধর্মের ভান করতে করতেও কেউ কেউ নাকি সত্যিই শেষ পর্যন্ত ধার্মিক হয়ে যায় ; বেশ, যদি 'তা হয়, তাহলে পাগল সাজতে গিয়েও ত' কারুর কারুর সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় ?

এক মুহূর্তে সমস্ত উত্তেজনা সরে গিয়ে এসে দাঁড়ায় ডাক্তারের ভেতরের মানুষটা; সৌম্য, সহানুভূতিতে সজল, প্রশান্ত, প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। ডাক্তার আসন টেনে নেন; পাইপে আবার আগুন দেন; চা আনতে বলেন। তারপর হাসেন; সেই মধুর-বিষণ্ণ হাসি।

'শোন, কথাটা শুনতে হাসির; এই 'সাজা পাগল' কথাটা শুনতে; কিন্তু হাসির পেছনে কি কান্না এবং কত বড় ট্রাজেডীর সম্ভাবনা তার অন্তত একটি সত্য ঘটনা আমি জানি। ঘটনাটা এদেশের নয় বিলাতের। আমি তখন বিলেতে; যাঁর কাছে চিকিৎসা-বিদ্যার শিষ্যত্ব করেছি গ্রহণ, তিনিই আমাকে এ-ঘটনা বলেন। এ-ঘটনাটির প্রথম অংশের দলিল এখনও মিলবে ইংল্যাণ্ডের ক্রিমিন্যাল কেসের রেকর্ডে; বইতে; অথবা পুরানো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়; কারণ আদালতে আজ পর্যন্ত যত নরহত্যার মামলা উঠেছে, এটি উত্তেজনা-সৃষ্টিতে তার মধ্যে শীর্ষস্থানে উল্লিখিত হতে পারে অনায়াসেই। কিন্তু রায়দানের সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের সমস্ত উত্তেজনার শেষ হয়ে যায়; তাই এর পরবর্তী ট্রাজেডীর ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞাত-ইতিহাসের রোমাঞ্চ যেদিন প্রথম শুনেছিলাম অধ্যাপকের কাছে, সেদিনও যেমন, আজও তেমনি, রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখ, তোমাকে এই ঘটনা আবার বলতে গিয়ে।'

ঘটনাটার পাত্র-পাত্রীরা সবাই লণ্ডনের অভিজাত শ্রেণীর।

ড্যানিয়েল, তার স্ত্রী এ্যানি এবং রবার্টস, এঁদের পারিবারিক বন্ধু, এদের তিনজনকে নিয়েই এই নাটক। এই নাটকের যবনিকা উঠল একদিন একটি লাইবেল কেসের মামলার শেষে। তরুণ ব্যারিস্টার ড্যানিয়েল এই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল ধুরন্ধর এবং সেদিনকার 'লীডার অফ দি বার' রবার্টসের। মামলায় জিত হবার পরেও ড্যানিয়েল ভাবতে পারেনি যে আরও বড় পুরস্কার রয়েছে তারই প্রত্যাশায়। ছ'ফিট লম্বা, দুর্দান্ত আকর্ষণ রবার্টস, উদ্ধত আর অবিনয়ী লীডার অফ দি বার, এসে করমর্দন করল ড্যানিয়েলের।

সেদিন রবার্টসের একটু প্রশংসার দাম অমূল্য। লণ্ডন-রার জানল রবার্টসের জায়গায় একদিন ড্যানিয়েলই যাবে।

ড্যানিয়েল একটু সঙ্কুচিত হয়েই সে-রাতে রবার্টসকে নিমন্ত্রণ করল ডিনারে, স্বগৃহে। ড্যানিয়েলের স্ত্রী এ্যানি ততদিনে অপ্রত্যাশিত অভ্যাগত নিয়ে স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকায় প্রস্তুত হয়েই থাকত। সেদিন সন্ধ্যের একটু পরে যখন ড্যানিয়েলের সঙ্গে রবার্টস এলো, এ্যানি এতটুকু অপ্রস্তুত না হয়ে অভ্যর্থনা করল রবার্টসকে এমনভাবে যেন তারই অপেক্ষা করছিল সকাল থেকে।

সেই স্মরণীয় সন্ধ্যা এই তিনটি মানুষের জীবনে অবিস্মরণীয় হবার আগের- মুহূর্ত পর্যন্ত ড্যানিয়েল এবং এ্যানির চেয়ে সুখী দম্পতি সারা ইংল্যাণ্ডে আর ছিলো কি না সন্দেহ। কিন্তু সন্ধ্যেয় বিপ্লব ঘটে গেল এ্যানির মনে। অবশ্য সেদিন এ্যানির মনের অবস্থার আঁচ পায়নি কেউ। ড্যানিয়েল ত' নয়ই; রবার্টসও নয়। কারণ, এ্যানি স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে এমন ব্যবহারই করত; যেন তাদের কাউকে একদিন না দেখলে সে মরে যাবে। তার এই অভিনয়ের পেছনে থাকত স্বামীর প্রতি অবিচল অনুরাগ; এবং স্বামীকে সামাজিক প্রতিষ্ঠার শীর্ষে নিয়ে যেতে তার এই ব্যবহার ছিলো ড্যানিয়েলের দাঁড়াবার চরম অস্ত্র।

কিন্তু সন্ধ্যেয় রবার্টসকে প্রথম সাদর অভিবাদন জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই এ্যানির কোথায় কি হয়ে গেল; সে ধরে রাখতে পারল না নিজেকে; স্বামী-সমাজ-সংসার মিথ্যে হয়ে গেল সব।

রবার্টস আসতে লাগল ড্যানিয়েলের সঙ্গে; ড্যানিয়েলের আড়ালেও। প্রেমের লুকোচুরির মুখরোচক গল্প ছড়াতে লাগল এর মুখ থেকে ওর কানে। ড্যানিয়েলের কাছে গিয়েও পৌঁছল সে-খবর। ড্যানিয়েল হাসল। নিজেকে সে জানে; জানে নিজের স্ত্রী-কে।

কিন্তু ড্যানিয়েলও একদিন আর হাসতে পারল না; একদিন একটি উড়ো চিঠি এলো একটি খবর নিয়ে; একটি বিশেষ রাস্তার একটি বিশেষ বাড়ি রবার্টস ভাড়া নিয়েছে 'R' এই আদ্যাক্ষরে; এবং ড্যানিয়েলের স্ত্রী এ্যানি সেখানে যায় রোজ অভিসারে; দরজার বাইরে কালো একটি রুমাল ঝোলানো থাকে; রবার্টসের সেই সময়ে ওই বাড়িতে উপস্থিতির সঙ্কেত হিসেবে!

কোর্টে গিয়ে একজন কেরাণীকে সেই রাস্তায় সেই বাড়ির খবর করতে বল্লেন! এক ঘণ্টা বাদে কেরাণীটি এসে তাকে যে খবর দিল তারপর আর কাজ করতে পারল না ড্যানিয়েল। আদালতে তার সেই শেষ কাজ। 'R' নাম দিয়ে রবার্টসই সেই বাড়ি ভাড়া নিয়েছে।

স্ত্রীকে ত্যাগ করল ড্যানিয়েল। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে তার স্ত্রী যখন নিরুদ্দেশ হ'ল, তখন ড্যানিয়েলের ধারণা যে রবার্টসের সঙ্গে কোথাও চলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গের মুহূর্তে এ্যানি যায়নি রবার্টসের কাছে। রবার্টস এল এ্যানির খোঁজ করতে একদিন ড্যানিয়েলের কাছে। তারপর কি হয়েছিলো, ওদের মধ্যে, সে কথা বলবার জন্যে আজ আর কেউ নেই, কিন্তু আধ ঘণ্টা বাদে ড্যানিয়েলের রক্তাক্ত মৃতদেহের সামনে পিস্তল হাতে ধৃত হলো রবার্টস।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে অদ্বিতীয় উত্তেজনার সেই মামলা নিষ্পত্তি হবার আগেই রবার্টস পাগল হয়ে গেছে বলে চিকিৎসকরা রায় দিলেন। রবার্টস সত্যি সত্যি পাগল হয়নি; কিন্তু একমাত্র সেই উপায়েই তাকে বাঁচানো যাবে বলে, পাগল সাজানো হ'ল তাকে। কি করে ইংল্যাণ্ডের বিশেষজ্ঞের মত আদায় করা হয়েছিলো, আজও তা আছে রহস্যের অন্তরালে। পুরোপুরি সন্দেহ নিরসনের জন্যে পাগলা গারদেও পাঠান হলো তাকে।

রবার্টসের বন্ধুদের চিন্তা হল শুধু পাগলা গারদ থেকে বেরুলে আইনকে ঠেকাবে কি করে তারা; কিন্তু বিচলিত হলেও, একেবারে আশা ছাড়েনি। আশা ছিলো তাদের রবার্টসই; রবার্টস, এক

সময়ের 'লীডার অফ দি বার', ধুরন্ধর ব্যারিষ্টার, নিশ্চয়ই বার করতে পারবে নিজের বাঁচবার রাস্তা।

কিন্তু এক বছর বাদে তারা যখন দেখা করতে গেল রবার্টসের সঙ্গে, তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই বোঝা গেল, পাগল সাজতে গিয়ে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে সে! সম্পূর্ণ উন্মাদনার ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারা!

'আশ্চর্য!' —নিজের অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

'না'—ডাক্তার বলেন, এখনও আশ্চর্য হবার সময় হয় নি; শোন!

এর বহু বছর বাদে মৃত্যুশয্যায় তখন রবার্টস; মরবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তার ব্যবহার আবার আশ্চর্য করল সবাইকে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লোকের ব্যবহার। কেউ কেউ ভাবল মরবার আগে প্রাণের শিখা জ্বলে উঠেছে বুঝি! কিন্তু রবার্টসই নিরসন করল সকলের জিজ্ঞাসার। রবার্টস বলল: আমি এত বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও পাগল হইনি। পাগলের অভিনয় করে গেছি।

কেন?

'কারণ তা না হলে আবার আমাকে আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হত; ইংল্যাণ্ডের আইন বলে, কোনদিন যদি আবার সুস্থ হয় আসামী, তা'হলে আবার তাকে দেওয়া হবে তার পাওনা শাস্তি।'

'কিন্তু', ঘনিষ্ঠ একজন জানতে চাইল: 'পাগল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো ছিলো না?'

'না', রবার্টস জবাব দিল: 'কোনও লোক মরতে চায় না; যদিও মুখে বলে মানুষ, যন্ত্রণায়, অনাহারে, অপমানে, লাঞ্ছনায়, যে এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। তবুও মরতে সত্যি সত্যি কেউ চায় না জেনো। পাগল হয়েও বেঁচে থাকতে চায়; পাগল না হয়েও পাগল সেজে বেঁচে থাকতে চায় সে। গলার স্বর কমে আসে। আধ ঘণ্টা বাদে মৃত্যু হয় রবার্টসের!'—ডাক্তার উঠে যান শেষ কথা কটা বলে।

চার

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছিলাম ঃ 'আচ্ছা, পাগলামী কি সারে ?'

ডাক্তার তার জবাবে উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করেন ; 'তুমি যাকে পাগলামী বল, আমি তাকে বলি মনের রোগ ; বেশ তুমিই বল শরীরের রোগই যদি সময়ে চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে সারে ? মনের রোগও সময়ে ধরা পড়া চাই—।'

'মানে ?'—আমি জিজ্ঞেস করি আবার।

ডাক্তার—'মানে খুব সোজা ; নানা কারণে, টাকার অভাবে ও ডাক্তারের অভাবে, হাসপাতালের অভাবে, বহু বছর পরাধীন থাকা-কালীন বিদেশী সরকারের সহানুভূতির অভাবে এবং খানিকটা স্বভাবে আমরা অত্যন্ত চিকিৎসাবিমুখ জাত ; আগে আমরা বললাম ঃ অমুক লোকটা তিন-দিনের অসুখে মারা গেল ; জানতামই না, অসুখটা কি ; এবং না জেনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে এখনও অনেক প্রাচীন লোক ; তাদের ধারণা তাদের সময়ে আজ যে এত অসুখ হচ্ছে, এ-সবের নাম গন্ধ ছিলো না। ঠিকই বলে তারা ; অসুখ ছিলো ; শুধু অসুখের নাম জানা ছিলো না ! আজ আমরা অসুখের নামে ভয় পাই যতটা, অসুখে ততটা নই ; ক্যানসার শুনলেই আমাদের হয়ে যায় ; কিন্তু এই ক্যানসারের প্রথম লক্ষণ ধরতে পারলে সারানো চলে এই আপাত-দুরারোগ্য ব্যাধি ! যদিও একথা খুবই ঠিক যে, ক্যানসার রোগের প্রথম উপসর্গ ধরতে পারা সাধারণ লোকের পক্ষে ত' বটেই, অনেক ডাক্তারের পক্ষেই ভয়ঙ্কর শক্ত এবং সেই কারণেই প্রয়োজন গ্রামে, সহরে এবং পারলে পাড়ায় পাড়ায় 'হেলথ্-সেণ্টার' খোলা ; সেখানে বছরে দু'বার না-হলে অততঃ একবারও প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেকে দেখিয়ে নেবে নিজেকে,—কোথাও কোনও গোলমালের সূত্রপাত আছে কি না ! মোটর-

গাড়ীর সার্ভিসিং করাই আমরা প্রত্যেক মাসে ; কিন্তু মানুষের করি না। কারণ এখনও মোটরগাড়ীর দাম মানুষের মূল্যের চেয়ে বেশি। মোটরগাড়ীর ড্রাইভারের মাইনে বেশি মাষ্টার-মশায়ের চেয়ে।'

'আসল কথাটা কি ডাক্তারের' ?—ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, ডাক্তারের নজর এড়ায়নি।

ডাক্তার—'কী বলতে চাইছি, ভাবছ ? বলতে চাইছি, যে শরীরের ক্যানসারের মত মনের ক্যানসার রোগও হয়; তারও হয় প্রথমে কতগুলো উপসর্গ। সেই উপসর্গই হল মনের রোগের প্রথম পদক্ষেপ এবং উপসর্গগুলো প্রকাশ পায় নানান ব্যবহারে, আমরা হয় তা লক্ষ্য করি না, নয় লক্ষ্য করলেও উড়িয়ে দিই।'

আরেকটু বাদেই ডাক্তারকে 'লেকচার'-এ পাবে, তাই বাধা দিই। বলি ঃ 'এ খানিকটা বেশি-বেশি হয়ে যাচ্ছে না ডাক্তার ?'

'না', ডাক্তার জোর দিয়ে বলেন ঃ বেশি বেশি বল্লে বলতে পারো, কিন্তু তা নয় ; কোন মেয়ের হিষ্টিরিয়া হলে আমরা বলি, বিয়ে দিলেই সেরে যাবে ! গ্রামের লোক টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে, খবরটা না জেনেই যখন কাঁদতে বসে, তখন আমরা হাসি ; কিন্তু আমাদের সহরে এখনও অনেক শিক্ষিত লোক মনের রোগে ওঝা ডাকে ; ঝাড়ফুক করে এবং করে না শুধু ; বিশ্বাস করে যে 'ভূতে' পেয়েছে।—এবং এতে কেউ কেউ হাসলেও আমি হাসতে পারি না ; কারণ এটা হাসির কথা নয় ; বরং এতে হাসি শুকিয়ে আসার কথা !

'এটা হাসির কথা না হতে পারে, কিন্তু হাসি শুকিয়ে আসার কী আছে এ-কথায়',—ডাক্তারকে রাগিয়ে দিতে না পারলে, ডাক্তারের কাছে কথা বার করা যাবে, কিন্তু 'কেস' বার করা যাবে না কিছুতেই, তাই তাতাবার চেষ্টা করি ডাক্তারকে !

ডাক্তার—'হাসি শুকিয়ে যাবার কথা এই কারণে যে, যে মেয়ের হিষ্টিরিয়া বিয়ে দিলে সেরে যাবে বলে আমরা নিশ্চিন্ত, সেই মেয়ের বিয়ের পর বেড়ে যেতে পারে হিষ্টিরিয়া, এ-জ্ঞান নেই আমাদের ;

দেহের রোগে যমে ডাকলে তবে আমরা যাই ডাক্তারের কাছে, না বাঁচাতে পারলে দোষ দিই ভাগ্যকে অথচ সময়ে গেলে শুধু রুগীকে বাঁচানো নয়, বাঁচানো যায় অনেক বিনিদ্র রাত্রি-যাপনের ক্লান্তি আর অনেক অকারণ অপব্যয়ের গ্লানি থেকে! মনের রোগেও তাই; উড়িয়ে না দিয়ে সময়ে ঠিক হয়ে যাবে বলে, সময় থাকতেই যদি বেঠিক মনকে মেরামতের কাজে লাগা যায় তাহলে রাঁচীর মানসিক রোগের হাসপাতাল হয় রুগীশূন্য; লুম্বিনী পার্কে দর্শকের মজা দেখার মহোৎসবে আসে মন্দা।

ডাক্তার ক্ষেপেছেন; এবার আশা করতে লাগলাম খুলবে রহস্যের নিষিদ্ধ লোক এবং আমার অনুমানই ঠিক হলো। ডাক্তার গল্পে এলেন এবারে।

বছর কয়েক আগে একটি লোককে আমার কাছে যখন নিয়ে আসা হ'ল তার অনেকদিন আগেই সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে সে; তার পুরো ইতিহাসটা শুনতে শুনতে এই কথাই আমার বারবার মনে হয়েছিল যে যদি আর একটু আগে আসত লোকটা! ক'টা দিন আগে! ধাপে-ধাপে পা ফেলে-ফেলে লোকটা একটু একটু করে এগিয়েছে পাগলামীর পথে; প্রত্যেক ধাপেই তাকে ঠেকানো যেত পতন থেকে; কিন্তু কারুর কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে, নিজের মনের কথা বলতে না পেরে কাউকে, আস্তে আস্তে মানসিক বিকৃতির শেষ পর্যায়ে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেল একটি স্বাভাবিক, সুস্থ, সতেজ মানুষ। পেযাগত গোপনতা-রক্ষার দায়ে লোকটার নাম দেওয়া যাক এখানে সুবর্ণ চৌধুরী।

[redacted]কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রের তালিকায় খুঁজলে সুবর্ণ চৌধুরীর আসল নাম পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। কারণ তার সময়ে সে ছিল পরীক্ষার্থী সমস্ত ছাত্রের বিভীষিকা। কিন্তু শুধু ভালো

ছেলে নয়, অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্র ছিলো, স্থবর্ণ চৌধুরী যার এই গল্পে কল্পিত নাম। জনপ্রিয়তা সম্ভব হয়েছিলো প্রধানতঃ তার আবৃত্তি-নৈপুণ্যে ; দ্বিতীয়তঃ লেখবার ক্ষমতাসম্পন্নতায়। ছাত্র-জীবন অতিক্রম করবার পর লেখক হিসেবে প্রভূত প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিল স্থবর্ণ। তারপর চাকরী-জীবন শুরু করে, বিবাহ করল ; ছেলেপিলে হল যথাসময়ে ; সংসারের পাকা-খাতায় নাম লেখাল সে। কিন্তু লেখা বন্ধ হল না ; বন্ধ হল না আবৃত্তি, ক্যারিকেচার ; হাসি-রসিকতা। তেমনি বেপরোয়া ; তেমনি দিলদরিয়া, তেমনি জমাটি, রসাল-ব্যক্তিত্ব, স্থবর্ণ চৌধুরী সংসারী হয়েও আর পাঁচজনের মত হল না সাধারণ !

এই সময়ে একদিন দেখা গেল স্থবর্ণ বাইরে থেকে ঘরে ফিরে সাধারণ সাবান দিয়ে হাত-পা ধোয়ার বদলে কার্বলিক সাবান ব্যবহার করতে শুরু করলে ; ব্যাপারটা লক্ষ্য করল সবাই, কিন্তু গ্রাহ্য করল না কেউ, করবার কথাও নয় ; কারণ সংসারে হাজারো লক্ষ লোক প্রতিদিন পরিষ্কার হবার জন্যে ব্যবহার করছে কার্বলিক সাবান, তাতে বরং আরও পরিষ্কার থাকবার দিকে স্থবর্ণ নজর দিয়েছে বলে, বাড়ির সকলেই বিশেষ-করে বুড়ো-বুড়ীরা খুসীই হ'ল। এর ক'দিন বাদেই জানা গেল, স্থবর্ণ ডেটল দিয়ে প্রত্যেকবার অঙ্গ পরিষ্কার করছে। সেই সঙ্গে আরও জানা গেল যে, হাত পা-মুখ ধোয়ার পাট একটু বেড়ে গেছে তার এবং তার ক'দিন বাদে স্থবর্ণের পরিবারে প্রত্যেকে খোলাখুলিভাবেই বলে বেড়াতে লাগল স্থবর্ণ হাত-মুখ ধোওয়া-ধুইর ব্যাপারে বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। স্থবর্ণকে তারা ঠাট্টা করল ; তিরস্কার করল ; ব্যঙ্গ করল এই বলে যে, বিধবাদের মনোপলি ছুঁচিবাই-তে পেয়েছে দু' ছেলেমেয়ের বাপকে।

এইটুকু বলে ডাক্তার আমার দিকে আবার তাকালেন ; শুনলাম ডাক্তার বলছেন ঃ স্থবর্ণকে সেদিন যারা ঠাট্টা আর বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গ করেছে, তারা জানে না যে, ছুঁচিবাই বিধবাদের মনোপলি নয়,

নয় সামান্য 'বাই'; আসলে 'ছুঁচিবাই' মারাত্মক মনোবিকৃতির প্রথম সুস্পষ্ট চিহ্ন; শুচিবাতিক, থেকে 'ছুঁচিবাই' কথাটা ভাষা-তত্ত্ববিদেরা মানবে কিনা জানি না বলে ডাক্তার হাসলেন, তারপর বল্লেন: কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকরা সকলেই মানবেন যে শুচিবাতিক সামান্য বাতিক নয়; সময়ে সচেতন না হলে সুদূরপ্রসারী এর প্রভাব, গভীর-মূলে এর বিশেষ সুনিশ্চিত প্রবেশ; গোটা মানুষটাকে এই বাতিক একবার ধরতে পারলে, গিলতে থাকে, তারপর এক-সময়ে সে আর মানুষ থাকে না; মানুষের চেহারায় আসে পাগলের-প্রমত্ততা।

সুবর্ণ চৌধুরীর জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিলো সেই মুহূর্তে একজন সহৃদয় বন্ধুর। সেই বন্ধুর উচিত ছিলো মনোরোগের কোনও বিশেষজ্ঞের কাছে সুবর্ণকে নিয়ে যাওয়া; নিয়ে গেলে যে-কোন মনস্তাত্ত্বিক সেই সময়ে সুবর্ণর চোখে কী দেখতে পেতেন? দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখতে পেতেন মানসিক বিকৃতির পূর্বাভাস। আস্তে-আস্তে উদ্ঘাটিত করতে পারত সুবর্ণই তাঁর কাছে তার অস্বাভাবিক ব্যবহারের পূর্বাপর ইতিহাস: সে ইতিহাস সাক্ষী দিত এই বলে যে, সুবর্ণ সেই সময়ে কোনও অসৎ-সঙ্গের আওতায় গিয়ে পড়েছে।

'হ্যাঁ', ডাক্তার আমাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, অবাক হবার কিছু নেই, 'ছুঁচিবাই-এর পেছনে তাই হল নির্মম সত্য। আমি তোমাকে বলছি, বিশ্বাস করো, ডাক্তার বলেন, সুবর্ণ এই সময় একটি অসৎ-সঙ্গে গিয়ে পড়ে যাদের মনেপ্রাণে পরিহার করলেও, তাদের সঙ্গের প্রলোভন থেকে কিছুতেই দূরে থাকতে পারত না সে; তারপর যেই বিচ্ছিন্ন হত সে, একা হত যেই, সেই তার মনে জমত তীব্র অনুশোচনা আর অশেষ গ্লানি। সেই অন্তরের কলুষ থেকে মুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করত সে বাইরে থেকে হাত-পায়ে জল ঢেলে। আমরা যে বিধবাদের কথা

তুলি ছুঁচিবাই-প্রসঙ্গে, সে-ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার। বিধবা হবার পর আমাদের সামাজিক অনুশাসন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় বাধা দেয় বলেই বিধবাদের সম্বল হয় বিকৃত কল্পনার সাহায্যে অস্বাভাবিক আর অসুস্থ আচরণ, তারই ফলে মন হয় অশুচি; সেই অশুচি মন নিয়ে বাইরের শুচিতায় বাড়াবাড়ি-রকমভাবে উদ্যোগী হয় তারা; বিধবাদের বেলায় শুচি বাই-এর সম্ভাবনার এই সামাজিক কারণ অত্যন্ত বেশি হলেও এ তাদেরই একক অধিকার নয়; কী পুরুষ কী স্ত্রীলোক দু'য়েরই কম-বেশি সম্ভাবনা আছে এই বাতিকের উৎকট আশ্রয়ে আসল রোগকে চাপা দেবার।

সে-কথা যাক; সুবর্ণ সম্বন্ধে পরের খবর হচ্ছে এই, যে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই প্রথমে বিরক্ত, পরে পরিত্যাগ করেছে তাকে। দাদাদের সঙ্গে একই বাড়িতে থেকেও সে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছে তখন; একখানা ঘরে বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে আছে বটে সেই বাড়িতে, তবুও সে যেন নেই; বৌ-ছেলে-মেয়েরাও ভয় করতে আরম্ভ করেছে। সারাদিন চান-করা, জল-ঢালা, ঘর-ধোয়া চলছেই ত চলছেই। যে দাদা ভালোবাসত সুবর্ণকে ছেলের মত, সেই দাদা প্রথমে তিরস্কার পরে প্রহারের ভয় পর্যন্ত দেখিয়েও নিরস্ত করতে পারে নি তাকে; দাদাদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়েছে এই সময়েই। পরিহাস করে যেসব বন্ধু জড়িয়ে ধরতে গিয়েছে সুবর্ণকে, তাদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়েছে সুবর্ণর। আজন্মের বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে!

চাকরী ছেড়েছে সুবর্ণ; ট্রামে একজনের জন্যে যে সীট থাকে সেইটে না পেলে দাঁড়িয়ে যায় সে; নামবার সময়ও হাতল ধরে না; ট্রাম ছেড়ে দেবার পর লাফিয়ে নামে; পড়ে গেছে এর ফলে বহুবার; মরতে-মরতে বেঁচে গেছে; তবুও বদলায়নি অভ্যেস। কার হাতে সাদা দাগ দেখে সন্দেহ করেছে কুষ্ঠের

এবং সেই কারণে বাড়িতে এসে ফেলে দিয়েছে ওয়াটার প্রুফ, জামা-কাপড় সব।

সেই সময়ে যদি সুবর্ণর মনের এক্স-রে প্লেট নেওয়া যেত তাহলে কি ছবি ফুটে উঠত তাতে? সেই 'প্লেট' কী সাক্ষী দিত? সে বলত, যে সুবর্ণ সেই অসৎ-সঙ্গের পাল্লায় আরও অনেক দূর এগিয়েছে অধঃপাতের রাস্তায়, খারাপ পাড়ায় যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে তার। যেসব পাড়ায়, যেসব মেয়েদের কাছে যাবার কথা ছিলো তার উদ্দামতম কল্পনারও আগোচর।

এবং সেই সঙ্গে একথাও আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, ওই সময়েই সুবর্ণর সন্দেহ হয় যে, তার খারাপ কোনও অসুখ করেছে এবং ডাক্তারের কাছে যাওয়ার লজ্জায় সন্দেহের নিরসন হ'ল অসম্ভব। ডাক্তার এবার টেবিলে ঘুঁসি-মেরে বলেন, সুবর্ণ নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে লাগল ডাক্তারী বই; যেসব বইতে এই সব খারাপ অসুখের প্রথম উপসর্গের আছে সচিত্র বিবরণ, তার সঙ্গে মেলাতে লাগল নিজের অবস্থা। সামান্য ফুসকুড়ি নিজের শরীরের কোথাও দেখলেই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল সে।

এরপর? এরপর এক আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘনিয়ে আনলো সুবর্ণর অন্তিম ট্রাজেডী। একমাত্র মেয়ের গায়ে ফোড়া দেখা দিল একটা; তারপর আর একটা; তারপর আরও একটা; তারপর অসংখ্য; রক্ত বেরুতে লাগল; পুঁজ পড়তে লাগল; পচ ধরতে করল আরম্ভ; দুর্গন্ধে বিষাক্ত হ'ল ঘরের হাওয়া। সবাই এল, এল না শুধু সুবর্ণ। অসহ্য যন্ত্রনায় কাঁদতে লাগল মেয়েটি; তাই পালিয়ে গেল সুবর্ণ; ঢুকল না ঘরে; দেখল না চেয়ে।

অনেক রাত্রে একদিন কান্নার আওয়াজ এল সুবর্ণর কানে; কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার করে বলছে তার মেয়ে; বাবা, তুমি আসবে না আমার কাছে? একবারটি আসবে না? আমি মরে যাবো বাবা,—ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়ে বসেছিলো সুবর্ণ; পারলো না

আর। দরজা ঠেলে ঢুকলো ভেতরে। জড়িয়ে ধরল মেয়েকে। সারারাত্তির শিয়রে বসে মেয়ের সমস্ত আবদার আর তার পুঁজ আর রক্ত আর দুর্গন্ধ গায়ে, মাথায় সব জায়গায় মাখল সুবর্ণ চৌধুরী। মা-ও যেমন সেবা করতে পারে না সন্তানের, তেমনি সেবায় সারারাত কাটাল সুবর্ণ তার মেয়েকে কোলে করে বসে। সকাল বেলায় ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটা।

সবাইকে অবাক করে সকলের সঙ্গে সেদিন খেতে বসল সুবর্ণ মাটিতে; সবাই ভাবল রাহুমুক্ত হল বুঝি এতদিনে সে; কিন্তু না; বেলা বারোটার সময় পূর্ণ-উন্মাদের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল; এতদিন যা হয়নি তাই হল; ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠল সুবর্ণ; ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখতে হল তাকে, সেইদিনই রাত শেষ হবার আগে মারা গেল সুবর্ণর মেয়ে।

ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'বলত', সুবর্ণ পাগল হয়ে গেল কেন?

আমি জবাব দিলাম: মেয়ের মৃত্যুর শকে!

'মোটেই না', ডাক্তার উড়িয়ে দিলেন: মেয়েটা মারা যাবার আগেই ত' পাগল হয়ে যায় সুবর্ণ; বরং বলা যায়, সুবর্ণ পাগল হবার মুহূর্তেও তার মেয়ে ভালো আছে, এই জেনেই গেছে!

'তবে'?—আমার প্রশ্ন।

সুবর্ণর বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছিল দিন থেকে দিনে, যে তার অনাচারের ফলেই তার মেয়ে মৃত্যুশয্যায়; গিল্টি কনসান্সের ভিক্‌টিম হয়েছে সে। তাই একদিন সমস্ত ভয় বিসর্জন দিয়ে সে গিয়ে বসেছিল মেয়ের মাথার কাছে। কোন কিছুই অস্পৃশ্য হয়নি সেদিন তার কাছে, ঘেন্না করেনি কিছুতে; ভয় পায়নি কোনটাতেই; কিন্তু মাত্র একরাতের জন্যই। সে রাতের অভিজ্ঞতা তার পক্ষে অতিরিক্ত হল; মরিয়া হতে চেয়েছিল সে; কিন্তু মনের জোর গিয়েছিলো নিঃশেষে ফুরিয়ে, তাই মেয়েটা যেই শান্ত হয়ে ঘুমোতে লাগল, সেই

মুহূর্ত থেকেই অশান্ত হয়েছে স্বর্ণ; চেতন আর অবচেতন মনের বিদ্রোহে পরাস্ত হল আরেকটি প্রাণ।

'শুধু'—ডাক্তার যেন কী বলতে চান;

'শুধু'—জিজ্ঞেস করি আমি 'শুধু কী—?'

'শুধু' ভালোর মধ্যে এই যে, স্বর্ণ চৌধুরীকে তার একমাত্র মেয়ের মরার খবর দিতে হয়নি; দিলেও কিছু হ'ত না; মরার আর বেঁচে থাকার অর্থ হয়ত এক হয়ে গেছে তখন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, এই গল্পে স্বর্ণ চৌধুরী যার কল্পিত নাম, তার কাছে।

পাঁচ

সেদিন, ডাক্তারের কাছে যেতেই, মনে আছে ডাক্তার একটা চিঠি বার করে বলেছিলেন ঃ 'পড়' ; দীর্ঘ চিঠি ; তলায় স্বাক্ষর নেই। বিহারের এক জায়গায় এক ডাকঘরের ছাপ মারা খামের ওপর। সেই চিঠিতে যে কাহিনীর উন্মোচন, পৃথিবীতে নেই এমন কোন কাহিনীকার, যে তাকে রূপ দিতে পারে, তার নিজের ভাষায় ; সে চিঠিতে নেই এমন কোন লাইন, নেই এমন কোন শব্দ, পরিবর্তন করা চলে যার একটি অক্ষরও। তার কারণ সে চিঠির কাহিনী বানাতে হয়নি কাউকে ; পাঠককে ভোলাবার জন্যে ফাঁদতে হয়নি মিথ্যে প্রেমের মেকী গল্প ; কোন না-দেখা দেশের পটভূমিকায় না-জানা পাত্র-পাত্রীদের বিদঘুটে নামের, বিচিত্র প্রবৃত্তির, বীভৎস কার্যকলাপে করতে হয়নি পাঠিকার বিস্ময়-সৃষ্টি ; পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ! ধান ভাণতে বসে গাইতে হয়নি শিবের গীত। সে চিঠি যার লেখা তাকে দেখিনি ; যাকে নিয়ে লেখা, তাকেও না ; কিন্তু তারা দু'জন এবং তাদের সঙ্গে সারা জগত এসে দাঁড়িয়েছে সেই চিঠিতে জীবন্ত হয়ে ; দাঁড়ানোর কথাই ; কারণ সে চিঠি বলেছে জীবনের গল্প,—হৃদয়ের ভাষায় !

কাজেই তুলে দিলাম সে চিঠি, পাত্র-পাত্রীর নাম-ধাম ছাড়া ; আর কিছুই না পরিবর্তন করে ; তুলে দিলাম অবিকল।

প্রিয় ডাক্তারবাবু,—

সব শেষ হয়ে যাবার পর নিশ্চিন্ত হয়ে তবে লিখতে বসেছি এই চিঠি আপনাকে ; আপনার কাছে যাবার শেষ হয়েছে প্রয়োজন ; ব্যস্ত হবার, ছটফট করার, ভয় পাবার পালা শেষ হয়ে গেছে সেই কবে। তাই, এই চিঠি আপনাকে লিখতে বসে আর নেই উত্তেজনার অবসর ; নেই, এই চিঠির জবাব পাবার তাড়া ; নেই, এই চিঠি পড়ে

আপনার কি মনে হয় তা' জানবার এতটুকু কৌতূহল। 'তবুও যে এই চিঠি লিখছি কেন', সে প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও, উত্তরের আবশ্যক নেই! যন্ত্রণায় চীৎকার করলে যন্ত্রণা কমে না, তবুও মানুষ চীৎকার করে কাঁদে যন্ত্রণায়; কেন? এ-কেন শুধু জিজ্ঞেস করা চলে, এর কোন জবাব হয় না!

মল্লিকাকে বিয়ে ক'রে যেদিন বাড়িতে নিয়ে এলাম, সেদিন কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিলাম আপনার কাছে তাকে নিয়ে কোনদিন যেতে হবে, ডাক্তার? -কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই যেতে হল আপনার কাছে; সমস্ত ব্যাপারটা শুনে আপনি ভয় করতেঁ বারণ করলেন, বল্লেন, মল্লিকার ইতিহাস অতি সাধারণ ট্রাজেডী; প্রচুর স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই হয় আবার একদিন ঠিকও হয়ে যায়; আরও বল্লেন আপনি যে, তার এই অদ্ভুত লজ্জার পিছনে আছে ছেলেবেলার কোন ঘটনা; যা এমন ছাপ ফেলেছে তার মনে; আর সেই ছাপ মোছেনি এতদিনেও তার মন থেকে; বরং এখন এসেছে তার জীবনে সেই মুহূর্ত, যখন বুদ্ধি দিয়ে সে জানে স্বামীর কাছে স্ত্রীর থাকতে পারে না কিছুই লজ্জার তবুও দীর্ঘকাল আগের সেই ঘটনা এসে দাঁড়াচ্ছে তার সামনে; সে-বাধা বিপুল বলে মনে হচ্ছে তার কাছে; সামান্য সংকোচ, মনে হচ্ছে দুস্তর; অকারণ আশঙ্কা,—শুধু অকারণ নয়, অমূলক; তবু তাকেই মনে হচ্ছে দুর্লঙ্ঘ্য; স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের দাবীকেও সে দিতে চাইছে না অধিকার! বহুদিন লালিত 'মিথ্যা', সত্য হচ্ছে, দাম্পত্য জীবনের চরম 'সত্যে'র চেয়েও!

আপনি ত' বল্লেনঃ ভয় পেও না; কিন্তু 'ভয় পেও না',—এই উপদেশই মাত্র যদি অভয় দিতে পারত সবাইকে, তাহলে থাকত না ভাবনা বলে বস্তুর কোন অস্তিত্ব। উপদেশের চেয়ে অনেক বাস্তব, ভাবনা; সান্ত্বনার চেয়ে অনেক সত্য, ভয়। তাই সত্যি-সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম। মল্লিকার একে কী বলব? 'লজ্জা' বল্লে, সামান্যই বলা হয়; সংকোচ বল্লে, বলা হয় না কিছুই। একে সবচেয়ে বেশী

ভাষায় বোঝান যায় যে কথা দিয়ে তা হচ্ছে 'বীতরাগ'! দাম্পত্য জীবনের প্রতি তীব্র বীতরাগ! বোবা মেয়েকে গছিয়ে দেয় লোকে; অন্ধ বা খোঁড়াকে; দুশ্চরিত্রা মেয়ে বিয়ে করে সংসারভ্রষ্ট হয় কেউ-কেউ; স্বাভাবিক যে বৃত্তি মানুষকে বিবাহে প্রেরণা দেয় তার প্রতি বীতস্পৃহার শোনা যায় কথা; ইচ্ছের বিরুদ্ধে সন্তানের জন্ম দেয় তারা; কোন রকমে সংসার বজায় রাখে। কিন্তু মল্লিকার এই লজ্জার কোন অর্থ হয় না। সংস্কার, শিক্ষার অভাব, রূপের কার্পণ্য কিছু দিয়েই তল খুঁজে পাই না তার,—সেই অতল রহস্যের!

মল্লিকার এই পালিয়ে বেড়ানোর কী হয় মানে? আর সকলের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর মানে না হলেও তাতে এসে যায় না কিছু; কিন্তু স্বামীর কাছ থেকেও পালিয়ে বেড়ানোর কেন এই আবরণ, অকারণ প্রয়াস? কীসের অভাব তার? শিক্ষায় আভিজাত্যে, দেহ-সৌষ্ঠবে, কোনদিকে সে কম? যে-কোন সমাজে মল্লিকার মত মেয়ে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায় না; এমনিতেও এই গল্প-গুজব করছে, হাসি-ঠাট্টা সব; এতটুকু নেই অস্বাভাবিকতা; কোথাও নেই অপ্রয়োজনীয় কুণ্ঠার চিহ্ন মাত্র; নেই প্রগল্‌ভতারও প্রমাণ; সপ্রতিভ; সজীব। কিন্তু যেই মাত্র সে বুঝতে পেরেছে কেউ লক্ষ্য করছে তাকে, ব্যস! সেই কোন ছুতো করে উঠে গেছে সে; আর দেখা দেয়নি! আমার চোখ পড়ে গেলে, পালিয়েছে আরও দ্রুত; আজও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তার অজ্ঞাতবাস!

আপনি উপদেশ দিয়েছিলেন অধৈর্য না হ'তে; অসহিষ্ণু না হ'তে; সময় যেতে দিতে চেয়েছিলেন; বলেছিলেন এমনই অনেক মেয়ে অসহায়-বলি হয় বিবাহের যূপকাষ্ঠে। বলেছিলেন পাশবিক-প্রবৃত্তিতে যে পুরুষ জানোয়ারের চেয়েও পশু, তাদের অবুঝ তাগিদ মেটাতে না পেরে এরা আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি পায়। আমাকে বলেছিলেন ঘুণাক্ষরে টের পেতে না দিতে যে মল্লিকার রহস্যের কিনারা করার জন্য ব্যস্ত হয়েছি আমি; বারণ করেছিলেন অঙ্গস্পর্শ

করতেও ; নিশীথ শয্যাতেও নয় ; কারণ বলেছিলেন বুঝতে পারলে সামান্য আঁচ পেলেও যে-কোন অনর্থের জন্য প্রস্তুত হতে দ্বিধা করবে না মল্লিকা।

অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলেছিলাম সেই নির্দেশ ; একদিনের জন্যে, মুহূর্তের জন্যে হতে দিইনি তার ব্যতিক্রম। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়েছি নিঃসঙ্গ ; বিবাহিত জীবনে। নাটকে-উপন্যাসে-কাব্যে জীবনের ট্রাজেডী দুঃখ-উত্তীর্ণ আনন্দাশ্রু আনে চোখে ; গভীর বেদনার উৎস থেকে সেখানে উৎসারিত হয় সুগভীর আনন্দের নির্ঝরিণী ! কিন্তু নিজের জীবনে যখন ভাগ্যের প্রহসন হয় অভিনীত, তখন ? তখন কি যার জীবনে ঘটে সেই ট্রাজেডী, সে কি পায় কোনও পুরস্কার ? কোনও তৃপ্তি ? কোন সান্ত্বনায় সে কি হয় শান্ত ?

যারা প্রবৃত্তির তাগিদ মেটাতে কোন পথ করে না পরিহার ; যারা বিবাহ না করে বোহেমিয়ান হবার বাহাদুরীতে অসামাজিক আচারে হয় প্রবৃত্ত, তাদের কাছে এ ট্রাজেডী মনে হবে হাস্যকর ; 'সেন্টিমেণ্টাল ফুল', বলে উড়িয়ে দেবে তারা। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে সামাজিক আইন কানুন মেনে চলতে যায় যারা, ছেলে মেয়ে বউ নিয়ে একটি সুন্দর সংসারের দেখে স্বপ্ন,—তাদের কাছে এ ট্রাজেডী না ফার্স ? বিয়োগান্ত নাটক না মর্মান্তিক পরিহাস ?

তবুও জানতে দিই নি মল্লিকাকে মুহূর্তের জন্যও আমার মনের অবস্থা। মল্লিকার মনেও কোনদিন ফেলিনি সন্দেহের ছায়া, অভিনয় করে গেছি যেন এইটাই স্বাভাবিক ; এইটেই হওয়া উচিত ; এই হ'ল আদর্শ বিবাহিত জীবন। শুধু ঘরেই নয় ; বাইরেও অভিনয় করে গেছি সুখী, স্বচ্ছন্দ দাম্পত্যের ; জানতে দিইনি কাউকে মানসিক বিপর্যয়ের ইতিহাস ; ইঙ্গিত দিইনি ; আভাস দিইনি ; এতটুকু সন্ধান পেলে মুখরোচক আলোচনায় মুখর হয়ে উঠত তারা আর তা গিয়ে পৌঁছত মল্লিকার কানে ; তারই আশঙ্কায় একা-একা দুর্বহ সেই ভার লাঘব করবার করিনি চেষ্টা।

গোপনে অনুসন্ধান করেছি মল্লিকার অতীত। মল্লিকার অতীত ইতিহাস থেকে উদ্ধার করতে পেরেছি যেটুকু তাতে জানা যাচ্ছে, ইস্কুলের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রী সে ; লেখা-পড়ায় এবং খেলা-ধূলায় একই সঙ্গে পারদর্শী হবার দুর্লভ কৃতিত্বে মল্লিকা এখনও পুরানো বান্ধবীদের, সেই সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদের জুড়ে আছে স্মৃতির পাতা ! তারা আজও ভুলতে পারেনি মল্লিকাকে ; কী করেই বা ভুলবে ? আবৃত্তিতে, অভিনয়ে, ইস্কুলের হ'য়ে চাঁদা তোলায় এমন কোনও ব্যাপার ছিলো না যা মল্লিকাকে বাদ দিয়ে ভাবা যেত ; মল্লিকা ছিলো ইস্কুলের সবচেয়ে ভালো ছাত্রী ; এবং তার সঙ্গে অপরিহার্য কর্মী !

শুধু সেই সঙ্গে এই খবরও পাওয়া গেলো ঃ যাকে 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে তা ছিলো না মল্লিকার তখনও। মল্লিকার বন্ধু ছিলো সবাই ; 'প্রাণের বন্ধু' একজনও না ! আমাদের সকলেরই এমন বন্ধু একজন না একজন থাকেই যার কাছে খুলে বলা যায়, তুলে ধরা যায় সব ; কিন্তু মল্লিকার এমন বন্ধু ছিলো না কেউ ; তা নিয়ে কারুর কিন্তু অভিযোগ ছিলো না একেবারেই, কারণ মল্লিকা বুঝতেই দিতো না সে-কথা ; এমনই গল্প-গুজবে, মেলা-মেশায়, হাসি-ঠাট্টায়, কাজে কর্মে ভরে দিতে পারতো সব ফাঁক যে তার কারুর কাছেই সম্পূর্ণভাবে ধরা না দেবার ফাঁকি দূরে থাক, সন্দেহই করত না কেউ ; বরং কাউকে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতে দেখলেই সরে যেত মল্লিকা জানতে না দিয়েই যে সে বুঝেছে অন্য পক্ষের মনোবাসনা।

এই অতীত-তথ্য আবিষ্কার ক'রে আবার একবার দেখা ক'রে-ছিলাম আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবু, মনে আছে আপনার ? আপনি বলেছিলেন মল্লিকার মনোসমীক্ষণের প্রয়োজন একবার, যাকে আপমাদের পরিভাষায় বলেছিলেন 'সাইকো-এনালিসিস'। কিন্তু তাতেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন আপনি ; ভয় পেয়েছিলেন ; ভেবেছিলেন, কোনও রকমে একবার মল্লিকা সন্দেহ করে যে তার রহস্যের কল্পা হচ্ছে অনুসন্ধান তাহলে ব্যর্থ ত হবেই আপনার প্রচেষ্টা, সঙ্গে সঙ্গে

আরও বিগড়ে যাবে সে; তখন সমস্ত চিকিৎসার বাইরে চলে যাবে মল্লিকা; বিকলাঙ্গের ওপর দৈহিক অস্ত্রোপচারের চেয়ে অনেক বেশী ঝুঁকি নিতে হয় মনোবৈকল্যে এই মানসিক অস্ত্রোপচারের বেলায়।

আর দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছিলাম আমি। ঠিক এই সময়েই ধরে রাখতে পারলাম না নিজেকে; সব প্রতীক্ষারই শেষ আছে; ধৈর্যেরও আছে বাঁধ ভাঙ্গার মুহূর্ত; সমস্ত সংযমেরই আছে একটা সীমা। আমি এসে পৌঁছেছিলাম সেই সীমানায়; আপনি পাশে থাকলে হয়ত ঠেকাতে পারতেন তখনও; কিন্তু একা-একা আর পারলাম না সেই অসহ্য অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে যেতে, হার হল আমার; যা করলাম, আজ বুঝতে পারছি তা' না করলেই ভালো ছিলো। কিন্তু সে কথায় এখন লাভ কার?

এই সময়েই একদিন ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়ে প্রায় অচেতন করলাম মল্লিকাকে; তার রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে গিয়ে যা আবিষ্কার করলাম; যে ধাক্কা খেলাম দুর্নিবার কৌতূহল নিবৃত্তির উৎসাহে, সে অনুভূতির প্রথম কয়েকটি মুহূর্ত ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব; মল্লিকা, আমার স্ত্রী, সম্পূর্ণ নারীও নয়; পুরুষও নয়; প্রকৃতির খেয়ালে অসম্পূর্ণ সৃষ্টি সে।

বিশ্বাস করুন ডাক্তার, প্রথম তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতির মুহূর্তগুলো কাটিয়ে উঠতেই সমবেদনায় ভরে গেলো আমার মন। দুঃখ হলো না; রাগ হলো না; এক আশ্চর্য করুণায় আপ্লুত হলাম; দুচোখ ভরে গেল জলে; তাকালাম মল্লিকার নিদ্রিত মুখের দিকে; তাকিয়ে মনে হলো, মল্লিকা আমার সন্তানের মা হ'তে পারবে না; না পারুক, সে হবে 'প্রথম নারী যে একজন পুরুষের সত্যিকারের হতে পারে সহধর্মিণী।

কিন্তু ভাগ্য করলে পরিহাস; নিয়তি—নির্মম ব্যঙ্গ। ঘুমের ওষুধের ক্রিয়া কাটিয়ে উঠে জেগেছিলো মল্লিকা; বুঝতে দেয়নি আমাকে। বুঝতে আর দিলও না; রাত শেষ হবার আগেই একদম

চুপ করে গেলো সে। সকাল থেকে পাগল হয়ে গেলো সম্পূর্ণ; বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানকই হয়ে উঠলো সে। ঘরে আটকে রয়েছে এখন!

মল্লিকা পাগল হয়ে গেছে বলে নয়, সে যে বুঝবার সময় পেলো না, বুঝোবার সময় দিলো না আমাকে যে তাকে জানবার পর তাকে আরও একান্ত করে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম আমি, শুধু সেই দুঃখটুকু রাখবার জায়গা, এত বড় পৃথিবীতে আমার কোথাও নেই!

ওই! ওই! মল্লিকা আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে ও-ঘরে; মল্লিকা! মল্লিকা!

স্বাক্ষরবিহীন সেই চিঠি এইখানেই সমাপ্ত বা অসমাপ্ত!

ছয়

আট নম্বর বাসটা বেগবাগানে এসে একটু বেশিক্ষণ থামে; 'টাইম' নেয়!

কিন্তু সেদিন থেমে রইল অনেক বেশি; বোঝা গেল বাসটা বিগড়েছে। বাসে করে যাচ্ছিলেন ডাক্তার · সঙ্গে আমি! নিজের মটর গাড়ী বাড়ির মেয়েরা নিলে ডাক্তার ট্যাক্সি চাপেন না; ট্রাম বাস করেন; তাও তাড়া থাকলে কাজের; তা না হলে সেই আদি ও অকৃত্রিম হণ্টন; মাইলের পর মাইল; রাস্তার পর রাস্তা; হাঁটতে পাওয়া ডাক্তারের কাছে যেন হাতে স্বর্গ পাওয়া!

বাস স্টপে এসে জুটেছিল এক উৎপাত; শতছিন্ন কাপড়ে; এক-মুখ দাড়ীতে; পুরো পা বেরিয়ে যাওয়া কেডস-এ; মাথায় একটা অদ্ভুত দেখতে না-হ্যাট, না-ক্যাপ, না-টুপিতে এবং সর্বোপরি হাতে ধরা একটা ময়লা কাগজ পড়ার ভঙ্গিতে লোকটাকে নজর না করে উপায় নেই। নজর করেই অবশ্য মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। কিম্ভুতকিমাকার সেই অপরূপ আকৃতি করুণার উদ্রেক করে না; করে হাসির। মাঝে মাঝেই তার আবেদন কানে এসে পৌঁছয়ঃ Can you help me babu? ইংরেজী উচ্চারণ কিন্তু বিস্ময়কর; রাস্তার লোকের মতও নয়; পাগলের মতও না!

বাস থেকে একটি দুটি করে নেমে যাচ্ছে লোক; কণ্ডাক্টর বোঝাবার চেষ্টা করে, বাস এখুনি চলবে; কিন্তু কে কার কথা শোনে! তারা কাজের লোক; ভাড়ার পয়সা ফেরত নিয়ে যে যার অন্য গাড়ী ধরে যাবার জন্যে একে একে পা বাড়ালো! বসে রইলাম আমরা দু'জনে; ডাক্তার আর আমি। আমিও যেতাম; কিন্তু এ-বাস ছাড়লে ডাক্তারের সঙ্গে হাঁটা ছাড়া নান্য পন্থা এবং তাও' পাক্কা সাড়ে ছ' মাইল; গাড়ীতে বসে থাকার বিরক্তি অবশ্য কম নয়; কানের কাছে সেই এক, ঘ্যানর-ঘ্যানরঃ Can you help me

babu ? লোকটা সুস্থ ; স্বাস্থ্য-সবল। কাজেই ভেবে নিতে কষ্ট হয় না যে ভিখারী হ'লেও ভিক্ষে ওর প্রয়োজন নয় ; পেশা। পাগল হলে, শুধু পাগল নয় ; সেয়ানা পাগল !

একটু বাদেই অন্য বাসের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমাদের ত্যাগ করে এগুলো সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ডাক্তার কোন কিছু ভূমিকা না করেই সুরু করলেন ঃ "আচ্ছা, তুমি জানো কি যে মার্কণী রেডিও-র আবিষ্কারক হলেও, আমাদের আচার্য জগদীশচন্দ্রের রিসার্চও এ-ব্যাপারে সমান উল্লেখযোগ্য ?" আমি বল্লাম ঃ জানি ; এত জানি যে অনেকের মতে ওদের দু'জনের নামই এক সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত ছিলো বেতার আবিষ্কারকের স্বীকৃতিপত্রে !

ডাক্তার বল্লেন ঃ এতটা দাবী না করলেও এটা অনায়াসেই মনে করে নেওয়া যেতে পারে যে দু'জনেই এ-ব্যাপারে বহু দূর এগিয়ে-ছিলেন ; মার্কণী স্বাধীন দেশের লোক ; তাঁর সুযোগ সুবিধে ছিলো বিস্তর ; আমাদের আচার্য অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে এগিয়েছিলেন আস্তে-আস্তে ; দু'জনেই শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে-ছিলেন ; একজন আগে এবং আরেকজন পরে ; এইমাত্র।

এরপর ডাক্তার আসল কথায় এলেন।

ডাক্তার ঃ 'ওত' গেল সত্যিকারের প্রতিভায়-প্রতিভায় শক্তি-পরীক্ষা ! কিন্তু এরকম ঘটনা কী জানো যে একজনের পরিশ্রমের ফল আরেকজন আত্মসাৎ করেছে ?

আমি ঃ জানি ; শুনেছি, একজনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হয়েছে আরেকজনের নামে।

ডাক্তার ঃ 'হ্যাঁ—! সেত' আকছার ঘটে ; বড়লোকের হয়ে বক্তৃতা থেকে বই লিখে দেওয়া সবই দারিদ্র্যের পেষণে অন্য লোককে মেনে নিতে হয়েছে ; মাঝে-মাঝে তা' নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা শেষ পর্যন্ত খবর কাগজ মারফৎ সাধারণের কৌতূহলের বিষয় হয়ে মিইয়ে গেছে আবার ! সে ঘটনা নয় ; যুগান্তকারী আলোড়ন আনতে সক্ষম এমন

রিসার্চ যার সারা জীবনের চর্চা, পুরস্কার তার না হয়ে অন্যের হয়েছে এমন ঘটনা জানো কিছু?'

আমি ঃ না!

ইতোমধ্যে কণ্ডাক্টর জবাব দিয়েছে; গাড়ী চলবে না। যে-ভয় করছিলাম, সেই হলো। ডাক্তার হাঁটতে সুরু করলেন; মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে; অগত্যা আমিও; পেছনে তখনও সেই ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক ঃ Can you help me babu? আর সামনে নীল-লাল হরেক রকম নিওনসাইনে তখন কলকাতায় আসন্ন হয়ে আসছে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে আরেকটি রাত্রি!

সেই রোমাঞ্চ-রক্তিম পট-ভূমিকায় দূর সমুদ্রগামী জাহাজের বিষণ্ণ গম্ভীর কান্নার মত বেজে এলো ডাক্তারের কণ্ঠে এক রহস্যময় পুরুষের জলদগম্ভীর স্বর ঃ তবে শোন ঃ

এই কলকাতা শহরের অসংখ্য অবজ্ঞাত মানুষদের একজন হল ঃ নরেন কাঞ্জিলাল। দরিদ্র; সেই সঙ্গে প্রতিভাবান। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পয়লা নম্বর ছাত্র। অধ্যাপক থেকে ছাত্র সকলের সমান প্রিয় ছিলো এই অপ্রিয়দর্শন; কিন্তু অসাধারণ নরেন কাঞ্জিলাল। সেখানে সবাই তাকে আইনস্টাইন বলে ডাকতো, আইনস্টাইনের সঙ্গে তার আকৃতিগত মিল ছিলো না সামান্যতমও; তবু তার বন্ধুরা যে তাকে ওই নামে ডাকতো, সে শুধু ভালোবাসার জন্যে নয়; তার প্রতিভা ছিলো তাদের কাছে সত্যি সত্যিই বিস্ময়ের বস্তু। এবং যত অবিশ্বাসেরই হ'ক না এ-কথা, তার বন্ধুদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে নরেন কাঞ্জিলাল তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে! জীবনের যে-ক্ষেত্রেই হ'ক, কাঞ্জিলাল একদিন 'আইনস্টাইনে'র মতই বড় হবে; বিশ্ববিশ্রুত হবে; মরবার পর হবে অমর!

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই-এস-সি পাশ করে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়তে এলো সে; ডাক্তার হবে। নরেনের

বাবার আশা ছিলো, ছেলে এবারে চাকরী-বাকরী করে খাওয়াবে; বুড়ো বয়সে নিশ্চিন্ত করবে ডাল-ভাতের প্রশ্ন; ছেলে ফের পড়বে এবং দুর্বহ-ব্যয় চিকিৎসা শাস্ত্র, শুনে, তিনি ছেলের ওপর তীব্র অভিমান করলেন। তিনি যে ছেলের জন্যে দু'মুঠো ডাল-ভাতের বেশি কিছু করতে পারেননি জোগাড়; ছেলে যে এতদূর পড়ে আজ উপার্জন সক্ষম হয়েছে, তার নিজের চেষ্টায়, এ-সব কথা তাঁর মনে এলো না একবারও। পেনসন-সম্বল বাপেদের শেষ বয়সে যে অকারণ অযৌক্তিক অভিমান হয়, তাঁর বেলাতেও ব্যতিক্রম হয় না তার। তিনি পুত্রকে অকৃতজ্ঞ মনে করলেন; জীবনে এমনই হয়, বলে ধিক্কার দিলেন; আর কি করলেন তিনিই জানেন।

নরেন কাঞ্জিলাল দরিদ্র-সন্তান; কিন্তু মনের দিক থেকে কোনদিনই দরিদ্র নয় সে; দমবার পাত্র নয়। এসে উঠলো কলকাতায় মামার কাছে। মামা 'প্রতিভা' নয় কিন্তু প্রতিভার পূজারী। অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে আশ্রয় দিলেন ভাগ্নেকে; আহারের ব্যবস্থা করলেন; কিন্তু পড়ার খরচ? তার সুরাহা করল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরাগী বন্ধুরা। তারা সবাই বিশেষ করে দু'জনে এগিয়ে এলো মুক্ত হস্ত হয়ে; এই দু'জন বহুবার উপযাচক হয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে নরেনকে; নরেন প্রত্যেকবার করছে প্রত্যাখ্যান; 'প্রত্যাখান' আরও বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছে নরেনের প্রতি এদের লক্ষ্য! এতদিনে নরেনের কাজে আসতে পেরে ধন্য হয়েছে তারা; কৃতার্থ মনে করেছে নিজেদের!

স্কলারশিপ আর প্রাইজ করতলগত হল, বছরের পর বছর নরেন কাঞ্জিলালের। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরুল পরীক্ষার পর পরীক্ষায় ইতিহাসের পর ইতিহাস সৃষ্টি করে; কিন্তু রিসার্চ করার সুযোগ হল না। বাবার অত্যধিক পীড়নে; বোম্বাইতে সামান্য মাইনেয় হাসপাতালের চাকরী নিয়ে চলে গেলো সে; মামার স্বার্থত্যাগ; বন্ধুদের প্রত্যাশা ব্যর্থ করে বড় হল সংসারের তাগিদ।

হারিয়ে গেলো বুঝি আরেকটি নদী রুদ্র রুক্ষ মরুপথে! আরেকটা জয়যাত্রা দিক্‌ভ্রান্ত হল পথের মধ্যে! আরেকটি আশার দিগন্ত মুছে গেল ব্যর্থতার কুয়াশায়!

কিন্তু না। ভাগ্য প্রসন্ন হল; বিজয়লক্ষ্মী ডেকে নিলেন নরেনকে; বোম্বাইতে মেডিক্যাল কনফারেন্সে একটি 'পেপার' পড়বার অনুমতি পেলো সে; সেই 'পেপ'র' শুনে তাকে হাত বাড়িয়ে কোলের কাছে টেনে নিলেন একজন চিকিৎসক; টেনে নিয়ে এলেন কলকাতায়! সংসারের তাগাদা মেটালেন। নরেন কাঞ্জিলালকে বন্ধ করলেন ল্যাবরেটারী-ঘরে; বল্লেন: রিসার্চ করো!

যে-চিকিৎসকটি নরেনকে নিয়ে এলেন কলকাতায় তাঁর মত ডাক্তার অসংখ্য আছে; কিন্তু তাঁর মত মানুষ সংসারে বিরল। নরেন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হলো; শ্রদ্ধায় নত করলো মাথা; কাণায়-কাণায় ভরা মন তার ভাষা খুঁজে পেলো না ধন্যবাদের!

সংসারের চিন্তা থেকে মুক্ত করলেন নরেনকে তিনি; বাইরের ভাবনা থেকে দিলেন নির্বাসন। রিসার্চের জন্যে ব্যয়বহুল এক্সপেরিমেণ্টের পর এক্সপেরিমেণ্টে জুগিয়ে গেল হিসেব না করা অর্থ; সঙ্কুচিত হতে মানা করলেন নরেনকে; সন্দেহের মধ্যে থাকতে বারণ। নির্ভয়, নিঃসংশয় হ'য়ে তবে শেষ করতে বল্লেন কাজ। নরেন উন্মত্ত হয়ে উঠলো ফলাফলের দিন ঘনিয়ে আসার মুহূর্ত্তের উত্তেজনায়!

পাঁচ বছর রিসার্চের পর হতাশ করল নরেন; আরম্ভেই গলদ হয়ে গেছে; যখন নিজের ভুল ধরতে পারলো নরেন, তখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র অর্থ হয়ে গেছে ব্যয়! লজ্জায়, ধিক্কারে আত্মহত্যা করবার কথা ছাড়া আর কোনও কথা মাথায় এলো না তার। কিন্তু নিরস্ত করলেন তার আশ্রয়দাতা; নিউটনের সেই রিসার্চের কাগজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নূতন উদ্যমে রিসার্চ আরম্ভের বিশ্ববিখ্যাত নজীর টেনে আবার তাজা করে তুল্লেন নরেনকে; পৈতৃক ভিটে বিক্রী করে দিয়ে আনলেন টাকা; বউএর গহনা বন্ধক রেখে; ঋণ করে,

সর্বস্বান্ত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নরেনকে দিলেন এগিয়ে যেতে ; কিন্তু জানালেন না নিজের দুরবস্থার খবর।

দু'বছর বাদে নরেন কাঞ্জিলাল প্রণাম করল এসে একদিন সেই চিকিৎসককে ; তিনি আশীর্বাদ করলেন নরেনকে ; আর কয়েকদিন বাদেই সমস্ত পৃথিবী জানবে আরেকটি আবিষ্কারের জন্ম ; আরেকটি পাতা জুড়বে ইতিহাসের আরেক পরিচ্ছেদে !

কয়েক দিনের মধ্যে সবাই জানলও ; রিসার্চের খবর জানলো তারা ; শুধু জানলো না নরেন কাঞ্জিলালের নাম ; রিসার্চ সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হল সেই চিকিৎসকের স্বাক্ষর !

নরেন কাঞ্জিলাল পাগল হয়ে গেল, খবর বেরুল যেদিন।

'এখন নরেন কোথায় ?'—জিজ্ঞেস করলাম।

'এখন ?' হাসলেন ডাক্তার ; 'এখন সে বাস-স্টপের সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করে : Can you help me babu ?—আর তোমার মত অনেকেই তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয় ; ভাবে ভিক্ষে ওর প্রয়োজন নয় পেশা ; কিম্বা ভাবে ও পাগল ; কিন্তু শুধু পাগল নয়, সেয়ানা পাগল।'

সাত

'সবচেয়ে বেশি বিষ কিসে বল দেখি নি ?'

জিজ্ঞেস করেছিলেন ডাক্তার। কয়েকটি মারাত্মক বিষের নাম করেছিলাম, মনে আছে। উত্তর শুনে ড'ক্তার সন্তুষ্ট হন নি। না-হবারই কথা ; কারণ সহজে জবাব দিতে পারলে ত' উকীল ডাক্তারের পক্ষে কোন কঁথা জিজ্ঞেস করাই বৃথা। তাই জানতাম আমার জবাব কাজের হবে না। তারপর ডাক্তার এক-সময়ে নিজের জিজ্ঞাসার নিজেই জবাব দিলেন। বল্লেন : সবচেয়ে বিষাক্ত বস্তু হচ্ছে, 'সন্দেহ', আর তার জন্মস্থান হচ্ছে, মানুষের মন।

অপরকে সন্দেহ করে আর নিজে সন্দেহের পাত্র হয়ে মানুষ যত জ্বলেছে, নিজেকে যত পীড়ন আর অপরের জীবনকে করেছে যত বিষাক্ত এমন আর কিছুতে নয়। ইতিহাসের অসাধারণ মানুষ থেকে প্রতিদিনকার পৃথিবীতে অতি সাধারণ নরনারীর জীবনও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ; দৈহিক মৃত্যুর অনেক আগেই একটু একটু করে পুড়ে পুড়ে মরেছে মানুষের মন শুধু মাত্র 'সন্দেহের' পদক্ষেপে ; প্রথমে যা সামান্য ঘটনা, পরে তা' অসামান্য নাটকে পেয়েছে পরিণতি।

বিত্তবানদের সন্দেহ, সবাই বিত্তাপহরণের কারণে তাদের বিষ দেবে ; ক্ষমতাবানদের সন্দেহ সবাই চায় তাদের গদীচ্যুত করতে ; পুলিশের বড়কর্তার সন্দেহ দীর্ঘ-মেয়াদের পর ছাড়া-পাওয়া আসামী-ঠাকুরের ছদ্মবেশে এসে খাবারের সঙ্গে বিষ মেশাবে, আপিসে বড়বাবুর সন্দেহ তিনি যে আপিসের সব খবর বড়-সাহেবের কানে তুলে এসে পৌঁচেছেন পদোন্নতির শেষধাপে, নূতন কর্মচারীটি এসে তারই বিরুদ্ধে আক্রোশের আগুন জ্বালছে আপিসের নিম্নবিত্ত কর্মচারীদের মনে ; শিল্পের সাধক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের সন্দেহ, তাঁর গলাটিকে চিরকালের মত নষ্ট করবার মানসে শত্রুপক্ষ সদা-জাগ্রত ;

তাই কোথাও গেলে কখনও ভুলেও 'পান' খান না তিনি ; পানের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবেই, এই তাঁর ধারণা নয়, বিশ্বাস।

সবচেয়ে সাধারণ যে সন্দেহ তা'হল স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ; বা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর। এই সন্দেহ ঘর ভাঙ্গে, হত্যায় উত্তেজিত করে ; আত্মহত্যায় নিষ্কৃতি খোঁজে। বৃদ্ধের যদি তরুণী ভার্যা হয় ত' সেই ভার্যার মত করুণার পাত্রী নয় আর কেউ ; বৃদ্ধ স্বামী সন্দেহ না করলেও অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুরাই সবার অলক্ষ্যে আস্তে-আস্তে সন্দেহের বীজ বুনতে থাকে বৃদ্ধের মনে। তারপর বৃদ্ধের অনুপস্থিতিতে ঘরে তালা বন্ধ হয়ে কয়েদীর জীবন-যাপন করতে হবে তরুণী স্ত্রীকে ; তারপর একদিন উদ্বন্ধনে উত্তেজিত করবে মেয়েটিকে সবাই এবং তারও পর সমস্ত ব্যাপারটি যেদিন আইন ও আদালতের পৃষ্ঠায় উঠবে, সেদিন হঠাৎ সচেতন হয়ে সমাজ চীৎকার করে বলবে ঃ অর্থের লোভে বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণীর বিবাহ দিলে এই পরিণতিই হয়। আমরা ঘরে-ঘরে দু'হাত তুলে নাচব আর বলব ; সাধু! সাধু!

সন্দেহের বিষে সব-সময়ই যে মানুষ মরে তা নয় ; যা হয় তা' মরার চেয়েও মারাত্মক ; এতে মানুষ পাগল হয়ে যায়। সন্দেহ হচ্ছে মনের চোরাবালি, যেখানে পড়লে মানুষ ক্রমাগত ডোবে, ওঠে না আর কোনওদিন !

বৃদ্ধের তরুণী ভার্যার ট্রাজেডী চিরকালের এবং তার উদাহরণ পর্যাপ্ত ; তাই উল্লেখযোগ্য নয় আর, কিন্তু তরুণের বৃদ্ধা ভার্যা, তার 'ট্রাজেডী' অসামান্য এবং অপ্রচুর ; তাই তার আবেদন নয় এখনও পুরানো এবং তেমনই একটি বিয়োগান্ত নাটক আজ তোমাকে শোনাই,—এই বলে ডাক্তার আরম্ভ করলেন তাঁর সেদিনকার গল্প !

রুক্মিণী সুন্দরীর নাম সারা ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত তখন ! গ্রামোফোন রেকর্ডের মহিমায় তার কণ্ঠ শ্রুত হয়েছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তর ; তারপর বিশ্রুত হয়ে উঠেছে ; অনেক গল্প ; আর অনেক কল্পনা তার গানের গলাকে জয়ের মালার মত জড়িয়ে ধরেছে একের পর এক।

জলসার পর জলসায় সুরের জাল বুনছে সুন্দরী রুক্মিণী ! ধরা পড়েছে সুরমত্ত আর সুরামত্ত সবাই ; উর্বশীর রূপ নিয়ে ; কণ্ঠ নিয়ে কিন্নরের ; বিশ্ব-সুরসভাতলে রুক্মিণী নয়, যেন কোন মায়াবিনী ধ্যানভঙ্গ করতে জন্মেছিলো পুরুষের ; জীবনের রঙ্গমঞ্চে তার পদক্ষেপকে আলো বলে গ্রহণ করেছিলো যারা, তারা সবাই দিকভ্রান্ত হয়েছিলো ; আলো নয় সে ছিলো আলেয়া !

তার মত বাঈজী আর হয়নি কিংবা আর কখনও হবে না, একথা বলা বাতুলতা ; কিন্তু শুধু বাঈজী হ'লে এসে যেত না কিছু ; কিন্তু অসামান্য রূপসী রুক্মিণীর উচ্চাশা ছিলো অপরিমিত ; তাই সমাজের সব শেষ ধাপ থেকে সুরু করে সব উপরের ধাপের দিকে এগিয়েছিলো সে ধীরে ধীরে প্রথমে অর্থ, তার পরে প্রচার, তার পরে প্রতিপত্তি এবং সবশেষে সামাজিক প্রতিষ্ঠা। বিবাহ করল রুক্মিণী সামাজিক প্রতিষ্ঠার শীর্ষে অধিষ্ঠিত এক যুবককে। একটি কন্যা হ'ল ; তারপর বিচ্ছেদ মামলায় বিচ্ছিন্ন হল রুক্মিণী আর সেই যুবক। সে-ঘটনা আস্তে আস্তে ভুলে গেলো লোকে ; কতকাল আগের সেই দুর্ঘটনা !

ভুলতে পারেনি শুধু একজন ; সুদূর বর্মায় তখনও সে ষোল বছরের বালক ; বৈজুরাম। রুক্মিণী সুন্দরীর গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড বুকে করে সে ঘুমোতে যায় রাতে ; ঘুম থেকে ওঠে রুক্মিণীর গানে। সহপাঠীদের ব্যঙ্গ, ঘনিষ্ঠদের বিদ্রুপ, ব্যাপারটার বিসদৃশতা কিছুই তাকে স্বপ্নভ্রষ্ট করতে পারে না ; তার মনের দিগন্তে জ্বল জ্বল করে সেই এক 'সুখ'তারা ! সুন্দরী রুক্মিণী !

তার পরে গেছে অনেক অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অজন্মায় অনেক ফসল কেঁদেছে, বন্যা-মহামারী-দুর্ভিক্ষ-প্লাবনে ; অনেক বসন্তের দাগে কালো হয়েছে ভারতবর্ষের মুখ ; শুধু ষোল বছরের কাঁচা কৈশোর বৈজুরামের উত্তীর্ণ হয়েছে আটাশ বছরের নির্জলা যৌবনে ; আর চল্লিশে পৌঁছে রুক্মিণীর যৌবন মুখ-থুবড়ে পড়েছে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে। রুক্মিণীর একমাত্র কন্যা পূর্ণিমা হয়েছে পঞ্চদশী।

বর্মা থেকে দিল্লীতে এসেছে তার অনেক আগেই সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী বৈজুরাম ; কলকাতার জলসায় রুক্মিণীর উপস্থিতির পোষ্টার পড়েছে দেয়ালে দেয়ালে, কাগজের পাতায়-পাতায় তার সচিত্র বিজ্ঞাপন। কয়েক ঘণ্টায় দিল্লী থেকে কলকাতায় পৌঁচেছে বৈজু সশরীরে, মনে মনে উপস্থিত হয়েছে মুহূর্তে !

কলকাতার জলসা শেষ হবার আগেই জীবনের জলসাঘরে বৈজুরাম আর রুক্মিণীর প্রণয়, পরিণয়ে সার্থক হতে দ্বিধা করেনি মুহূর্তকাল। বিবাহের খবর কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় বই হয়ে বেরিয়েছে। সরকারী চাকরী ত্যাগ করে রুক্মিণীকে বিয়ে করেছে বৈজুরাম, কারুর বারণ শোনেনি ; কান দেয়নি কাগজের রসাল বক্র ব্যঙ্গোক্তিতে, ভ্রূক্ষেপ করেনি বংশ-পয়িচয়ের কৌলীন্যে ; মুহূর্তের মধ্যে মিথ্যে হয়েছে সমাজ-সংসার ; জীবনের কলরব হয়েছে মিছে।

তখন রুক্মিণী শুধু গান গায় না আর ; তার সঙ্গে সে খুলেছে নাটকের পালা। সেই নাটকের পালায় নায়িকার ভূমিকায় নামে তার পঞ্চদশী কন্যা পূর্ণিমা। নায়কের ভূমিকায় তখন থেকে নামতে লাগল বৈজুরাম। রাতের পর রাত, সহর থেকে সহরে রুক্মিণী সুন্দরী প্রযোজিত নাটক জননন্দিত হলো বিপুলভাবে, তারপর একদিন ? রুক্মিণীর মনে কি জমেছিলো কে জানে ? সুন্দরী পূর্ণিমার মনেই বা কি হয়েছিলো সেদিন কে বলবে ?

একরাতে নাটকের যবনিকা পড়বার আগেই বৈজুরামের জীবনের নাটকে যবনিকা পতন হল আকস্মিক। শেষ দৃশ্যে নায়িকার ছুরিকাঘাতে নায়কের মৃত্যুতে নামল যবনিকা। সে রাতে রবারের নকল ছুরির বদলে সত্যিকারের শাণিত ছুরি বসিয়ে দিলো পূর্ণিমা বৈজুরামের বুকে ; মঞ্চের ওপর দর্শকের সামনে।

জুরীদের সঙ্গে একমত হয়ে পূর্ণিমার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়ে যখন উঠে গেলেন হাইকোর্টের হাকিম তখন মামলার শেষ হ'ল ; রহস্যের নয়। কেন পূর্ণিমা হত্যা করল বৈজুরামকে অথবা পূর্ণিমা নয়, অন্য

'কে পেছন থেকে এই হত্যায় মায়িকার অংশ গ্রহণ করেও অভিযুক্ত হল না; এমন-সব ফিস-ফাস আলোচনা হতে লাগলো তারও পর অনেকদিন! কিন্তু রহস্য রয়ে গেলো রহস্যই!

শুধু সমস্ত মামলায় একটিও কথা বলেনি রুক্মিণী সুন্দরী। কেবল কন্যার ফাঁসীর আদেশ শুনে পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠেছিলো রুক্মিণী!

এখনও রুক্মিণীর অট্টহাসি, পাগলা গারদের লোহার গরাদের ভেতর থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয় রাত্রির বুক চিরে নিশীথ দিগন্তে। সে হাসির তলায় অনেক কান্না! আর সেই চোখের জলে যদি কেউ পড়তে পারতো তার হাসির লেখা সে হয়ত পেত রহস্যের কিনারা! হয়ত সে জানতে পারতো, কে সেদিন পূর্ণিমার হাতে রবারের ছুরির বদলে তুলে দিয়েছিলো সত্যিকারের শাণিত অস্ত্র!

হয়ত সে জানতে পারতো! হয়ত; হয়ত নয়! কে জানে?

আট

সবিতাদিকে এই গল্পটা বলছিলাম।

গল্পটা আমার পড়া ডাক্তারের কেস-ডায়েরীতে।

কালো, বেঁটে, মোটা নাকের বাঁ-পাশে চামড়ার চেয়েও কালো, আস্ত সুপুরীর মত একটা আঁচিল, মাথার সামনের দিক কেশ বিরল, দাঁত পানের ছোপ ধরা; এই হলো ভূতনাথবাবু। ভূতনাথ চক্রবর্তী, কোন এক হাইস্কুলের হেডমাষ্টার। যখনকার কথা বলছি, তখনও তার বিয়ে হয়নি। কিন্তু বয়স ৩২ পেরিয়েছে; এখন বোধ হয় ছ'সাতটি হবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে। ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেছেন, রাঁচিতে পাঠান হয়েছিলো দু'বছর আগে, তারা বলেছে সারবে না। পাগল কেন হয়ে গেলেন, সে এক মজার গল্প।

একটি মেয়ে, তার নাম আমাকে যে এ গল্পটি বলেছে, সে গোপন করে গেছে কেন জানিনে। যাই হোক, তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এ-গল্পে আমি তাকে সুমিতা বলেই অভিহিত করব।

বছর বারো আগে সুমিতা বলে একটি কলেজের ছাত্রীকে তিনি পড়াতেন। এই ভূতনাথবাবু ছাড়া সতেরো বছর বয়সের আগেই তাদের বাড়িতে এমন কেউ আসতো না, যে একবার না একবার তার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে। এমন কি তার মাসতুতো পিসতুতো ভাইরাও তার সঙ্গে মিশবার লোভে সব সময় স্মরণ রাখতে পারতো না যে সুমিতা আর তাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য আত্মীয়তার একটা প্রাচীর আছে।

ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু ভূতনাথ চক্রবর্তী।

অবশ্য তাঁর সেদিকে কোনও লক্ষ্যই ছিলো না। তাঁর নিজের চেহারা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন। কারণ অন্যত্র ত বটেই, সুমিতাদের বাড়ীতে তাঁর চেহারা কথাবার্তা সব কিছুই

হাসির উদ্রেক করত। তাঁর এই চেহারার সঙ্গে কে আবার জুড়ে দিয়েছিলো যে, ভূতনাথবাবু নাকি বদ্ধ কালাও। ফলে, দরজা দিয়ে তিনি ঢুকছেন ঃ সুমিতার পরের ভাই বেশ উঁচু করেই বলে ঃ এই রে সুমিদি কোথায়? 'অমৃতসালসা খাওয়ার পরে' ঢুকছে। ভূতনাথবাবু সত্যিই কানে কম কিছু শুনতেন না। কালা হলেও এসে যেত না। তিনি এদের হাবভাব দেখে ও বুঝতেন সব। তবে কোন ভাবান্তর তাঁর মুখে কোনও দিন কেউ দেখেনি। বোধ হয় এ তাঁর গা-সাওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

কৌতুক করতে করতে এক-একদিন বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটে যেত। যেমন অনেক দিনের মধ্যে একটি ঘটনা একদিন এই রকম হল। সুমি কোথায় যেন গিয়েছিলো তার বাবার সঙ্গে। ভূতনাথ বাবু সন্ধ্যেয় যখন পড়াতে এলেন, তখনও সুমিতা বাড়ি ফেরেনি। বাইরের বড় ঘরে, সুমিতার দাদা এবং তাদের বন্ধুবান্ধবেরা আড্ডা দিচ্ছিলো। ভূতনাথবাবু ঢুকতেই তারা "এসো এসো মাষ্টার", বলে চেয়ার এগিয়ে দিলে। মনে হল তারা যেন ওৎ পেতে ছিলো। কি যেন ভূতনাথবাবু বলি বলি করেও না বলে, একধারে চুপ করে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। "দেখো মাষ্টার চেয়ার থেকে পড়ে না যাও, তুমি এই ইজিচেয়ারে বসো।" ভূতনাথবাবু সুমিতার বড়দাদার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড় কিন্তু মাষ্টার বলায় তিনি রাগ করেন না একটুও। সুমিতার দাদারা যে তাকে আপনজন ভেবেই মাষ্টার বলে এ-যেন তিনি বিশ্বাস করেন আর বিশ্বাস করবার কথাও, সুমিতার দাদার সবাইকে 'তুমি' বলা অভ্যাস হলে ত' ড্রাইভারকেও বলতেন। কিন্তু ভূতনাথবাবু স্পষ্ট শুনেছেন কুড়ি বছরের জীবন ড্রাইভারকে, জীবনবাবু বলে ডাকতে।

মাষ্টার একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

ভূতনাথবাবু আবার কি বলতে গিয়ে থেমে যান। তারপর বলেন ঃ 'সুমিতার আসতে কি দেরী হবে?'

'না, মাষ্টার, না। তুমি বোস না। তুমি কেবলই আমাদের এড়াতে চাও কেন মাষ্টার। আমরা তোমাকে নিয়ে একটু মজা করি। কিন্তু সত্যিই কি তোমায় পর ভাবি, বল তুমি একবার। যাক হ্যাঁ, মাষ্টার তুমি বিয়ে করনি কেন?' ওধার থেকে স্বমিতার ছোট ভাই বলে: 'কেন আপনি এখনও বিয়ে করেননি স্যার?'

'আপনার এমন স্বাস্থ্য'—একজন কোনধার থেকে বলে যেন। চাপা নয় সজোর হাসির সশব্দ ঢেউ শোনা যায়। হ্যাঁ, ভূতনাথবাবু সম্বন্ধে একটা কথা তোমায় বলিনি সবিতাদি—

এতক্ষণে আমি সবিতাদিকে ভালো করে লক্ষ্য করলাম। ফল ধরেছে, বানানো গল্পেই সবিতাদির হয়ে গেছে। আমি একটু হাসলাম।

হ্যাঁ, একটা কথা তোমায় ভূতনাথবাবু সম্বন্ধে বলিনি সবিতাদি।

ভূতনাথবাবুর থলথলে শরীর কল্পনা করা শক্ত। মুখ বাদ দিয়ে বুক আর পেট থেকে তাকে মেয়েছেলে বলেও ভুল হতে পারত।

ভূতনাথবাবু কথা বা হাসি কিছুতেই চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে বল্লেন: বড় সংসার রোজগার কম, তার ওপর আবার আমি বিয়ে করলে···

কিন্তু এ তোমার অন্যায় মাষ্টার, তোমার মত লোক যদি কন্যাদায় উদ্ধার না করে, ত দেশের মেয়েরা যাবে কোথায়? তোমার মত স্বামী পাওয়ার ভাগ্য কজন আর করেছে, এ প্রশ্ন তুমি অবশ্য তুলতে পার। কিন্তু না হয় নিতে কোনও মেয়েকে ক্ষমা ঘেন্না করে—।

হাসিতে ঘরের ছাদ ফেটে পড়বার উপক্রম হতেই স্বমিতার দিদি ঘরে ঢোকেম। ভূতনাথবাবুকে নিয়ে হাসি ঠাট্টায় তিনিও যোগ দেন। কিন্তু মাত্রা ছাড়ালে ধমকান, আজও বললেন, কি কচ্ছিস তোরা ওঁকে নিয়ে। এই যে মাষ্টারমশাই, স্বমি আসেনি এখনো?

স্বমিতার ছোট ভাই জবাব দিলে, না ছোড়দি বাবার সঙ্গে বেরিয়েছে।

ভূতনাথবাবু এতক্ষণে বললেন, আমার একটু কথা ছিলো।

বলুন।

ভূতনাথবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন : আমার ছোট একটি বোন, কাল রাতে মারা গেছে। তাই আজ এসেছিলাম দুদিনের ছুটি নিতে।

সুমিতার দিদির সমস্ত মুখটা লাল হয়ে গেল। ভাইদের দিকে তাকিয়ে বললেন : তোরা কি জানোয়ার? তারপর ভূতনাথবাবুর দিকে ফিরে এবার বললেন : আপনাকে আর এ বাড়িতে পড়াতে আসতে হবে না ভূতনাথবাবু। এরা থাকতে নয়। কথাটা বলে সুমিতার দিদি একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অনেক মজার ঘটনার মধ্যে এটি একটি।

শেষ পর্যন্ত ভূতনাথবাবুকে চাকরি কিন্তু ছাড়তে হল না। সুমিতার বাবা কড়া মেজাজের লোক। বাড়ির ছেলেদের ওপর আদেশ জারী হল : মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে তাদের কোনও প্রয়োজন নেই, কাজেই কথাবার্তা বলবার দরকার হলে বাড়ির বাইরে, বাড়িতে আর নয়। সুমিতার দাদারা চটলো, কারণ এতে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রেষ্টিজ গেলো। সুমিতার ছোট ভাইয়েরা চটলো বুঝতে না পেরে যে দাদাদের কেন মেজাজ গরম হল হঠাৎ তাদের ওপর। শুধু কালো বেঁটে, মোটা নাকের বাঁপাশে চামড়ার চেয়েও কালো আস্ত সুপুরীর মত একটা আঁচিল, মাথার সামনের দিক কেশ বিরল, দাঁত পানের ছোপধরা ভূতনাথ চক্রবর্তী আগের মতই পড়িয়ে যেতে লাগলেন লরেটোর ছাত্রী সুমিতা গাঙ্গুলীকে।

কিন্তু এ-গল্প তোমায় বলা যেত না সবিতাদি, যদি ভূতনাথবাবুর এমনি আসা-যাওয়াই চিরকাল চলত। একদিন সত্যিই এ-বাড়িতে আসা তার বন্ধ হল! কিন্তু শুধু বন্ধ হলেও এ-গল্প হত না। ভূতনাথবাবু একদিন—

সবিতাদি, একি তুমি যে আগে থেকেই নড়ে চড়ে বসছো—

দাঁড়াও আসল গল্পটা সুরু করি। তোমার এই আগেই উত্তেজিত হয়ে ওঠাটা অনেকটা হাসির জায়গায় আসবার আগেই যারা হেসে গড়িয়ে পড়ে, তাদের মত হল যে।

হ্যাঁ, ভূতনাথবাবু একদিন পড়াতে এলেন, রোজ যেমন আসেন, তেমনি। সুমিতা তাকে বললোঃ মাষ্টার মশাই, আজ আমি যাচ্ছি বন্ধুর বিয়েতে। আজ পড়ব না। আপনি কিন্তু চা খেয়ে তবে যাবেন। সুমিতা চলে গেল। মোক্ষদা চা দিয়ে গেল! ভূতনাথবাবু হাতের বইপত্তর-ব্যাগ টেবিলের ওপর রেখে, মানুষ যেমন করে জল খায়, তেমনি করে ঢক ঢক করে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিতে লাগলেন। সেদিন খুব তৃষ্ণার্ত ছিলেন তিনি। তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়ে তিনি থেমে গেলেন। সিঁড়ির গায়েই একখানা ছোট্ট ঘর—পর্দাটা সরে গেছে সিঁড়ির ওপর জানলাটার। সুমিতা কাপড় ছাড়ছে, তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না; সুমিতার হাত এসে সায়ার ফিতের কাছে থামলো। বাঁধন আলগা হয়ে এলো। ভূতনাথবাবু কিছুতেই নামতে পারলেন না। সব তাঁর ভুল হয়ে গেল। কালো বেঁটে মোটা; নাকের বাঁ-পাশে চামড়ার চেয়ে কালো আস্ত সুপুরীর মত একটা আঁচিল, মাথার সামনে দিক কেশ-বিরল, দাঁত পানের ছোপ ধরা ভূতনাথ চক্রবর্তীকে ওই অবস্থায় দেখতে পেলে সুমিতার বড়দা।

ভূতনাথবাবুর এরপর যেটুকু মনে আছে তা শুধু সুমিতার বড়দার একটা চীৎকারঃ "আপনি ওখানে কি করছেন?" অন্য কেউ হলে একটা যে-কোনও যত দুর্বলই হোক যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করত। ভূতনাথবাবুর পক্ষে তার কিছুই সম্ভব হল না। জ্ঞান তিনি হারাননি। কিন্তু সুমিতাদের বড় ঘরে কে তাঁকে কি বলল কিছুই তাঁর মনে নেই। যে বিরাট হৈ-হৈ পড়ে গেল বাড়িতে তাতে সুমিতার বাবাও বিচলিত হতে বাধ্য হলেন। সুমিতা শুধু এসে বলল, মাষ্টার মশাই

আপনি এখনি বেরিয়ে যান, আর আমায় পড়াতে আসবার চেষ্টা করবেন না কোনও দিন।

ওপরে উঠে এসে পড়ার ঘরে খিল দিয়ে টেবিলে বসে পড়ল। ছটা বাজলো ঘড়িতে পরপর আওয়াজ হল ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। একটি একটি করে হাতুড়ীর ঘা পড়লো আরেক জনের বুকে। গত তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম একটি সন্ধ্যে এলো' যখন ঘড়িতে ছটা, পড়ার ঘরে সুমিতা, শুধু টেবিলের ওদিকে সেই কালো, মোটা বেঁটে, নাকের বাঁপাশে চামড়ার চেয়েও কালো আস্ত সুপুরীর মত একটা আঁচিল মাথার সামনের দিকে কেশ-বিরল, দাঁতে পানের ছোপধরা ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী নেই তার জায়গাটিতে।

টেবিলের ওপর ভূতনাথবাবুর ব্যাগটা পড়ে আছে। তুলতে গিয়ে সেটা ভারি ঠেকল সুমিতার। ব্যাগটা খুলে ফেললো—বেরুল একটা মোটা খাতা—ভূতনাথবাবুর ডায়েরী। সুমিতা ভূতনাথবাবুর ডায়েরীতে পড়লে···

"আমার নাম ভূতনাথ চক্রবর্ত্তী। বিকলাঙ্গ কোনও লোকও বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি ঠাট্টা লোকের পায়নি। বিকলাঙ্গ লোককে সহানুভূতি করবার লোক আছে কিন্তু যেদিন থেকে প্রথম আমি স্মৃতিতে কথা ধরে রাখতে পেরেছি সেদিন থেকে আমার বুকে একটি দগদগে ঘা আজও আমি লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। প্রথম জ্ঞান হয়ে মার মুখে শুনেছিলাম, মা আমার বলেছিলেনঃ "আমার পেটে তুই এলি কি করে?"—সেই থেকে সেই ঘা একটুও শুকোয়নি। আজও যখনি কেউ আমার চেহারা দেখে হাসে, তখনি সেই পোড়া দাগের জায়গাটা যেন জ্বালা করে ওঠে······

সুমিতাকে ডাকতে এসে লোক ফিরে গেল। সুমিতার বাবা বল্লেন যাকঃ shock পেয়েচে। সময় দাও, ঠিক হয়ে যাবে।

সবিতাদিকে বললাম তুমি ভাবছ গল্প বুঝি এইখানেই শেষ, না এইখানেই সুরু। এ পর্যন্ত যা বললাম, তা সত্যি। অন্তত যে

আমায় বলেছিলো, তার কথা এ পর্যন্ত আজও আমি বিশ্বাস করতে রাজি আছি। কিন্তু এরপর নয়। এরপর সে আমায় যা বলেছিলো সেটুকুই বানানো। তবুও সেটুকু না বললে যেটুকু বলেছি সেটুকু বলার কোন মানে হয় না, তাই শোন।

এরপর সুমিতাদের বাড়িতে ভূতনাথবাবুর নাম আর কেউ শোনেনি। শুধু সুমিতার দাদা একদিন খাবার টেবিলে বললেন ঃ ওরে সুমি, সেই রাস্কেলটা নাকি বিয়ে করেছে। তোর সেই বদমায়েস মাষ্টারটা।

সুমিতার দিদি বললেন ঃ 'ছিঃ। রাস্কেল বলছ কেন? সুমিকে সে না একদিন পড়িয়েছিলো?'

আট বছর বাদে অনেক রাতে একদিন সেই ভূতনাথ চক্রবর্তীদের বাড়ির দরজার কড়া ভেঙ্গে পড়ার মত হতে, ভূতনাথবাবু নেমে এসে যাকে দেখলেন, আগে তিনি কোনও দিন তাকে দেখেচেন বলে মনে হোল না।

"আমরা এসেছি সুমির কাছ থেকে"—একজন নীচে থেকে বললে; 'সুমি'? বিমূঢ় ভূতনাথবাবুর প্রশ্নের উত্তরে এরপরে সুমির দাদা বললেন ঃ আপনার ছাত্রী সুমিতা গাঙ্গুলি। আপনাকে একবার এখুনি আমাদের বাড়ি যেতে হবে। গাড়ী এনেছি।

কেন?

গিয়ে শুনবেন।

কিন্তু শুনতে কিছু হল না ভূতনাথবাবুর। গিয়ে দেখলেন সুমিতা শুয়ে আছে খাটে, ডাক্তার পাশে। সুমিতা বকছে ঃ কেন আপনি আমায় বলেননি একথা মাষ্টারমশাই, আমায়ও কি ভুল বুঝেছেন? ······আট বছর আগেকার এক স্মৃতি—যেন মানুষের মত এসে দাঁড়ালো। আট বছর আগেকার সেই ধরা পড়ে যাওয়া সন্ধে। কিন্তু একি সম্ভব?—মাটিতে বসে পড়ে ভাবলো কালো, বেঁটে, মোটা নাকের বাঁপাশে চামড়ার চেয়েও কালো আস্তো সুপুরীর মত আঁচিল,

মাথার সামনের দিকে কেশ-বিরল, দাঁতে পানের ছোপ ধরা ভূতনাথ চক্রবর্তীর মাথা ঘুরতে লাগলো, এ কি সম্ভব ?

ভূতনাথ এক সপ্তাহ রাত্তির জেগে, দিনে না ঘুমিয়ে যার সেবা করলে সে কিছুই জানলো না। কারণ যেদিন প্রথম তার জ্ঞান ফিরে এলো, সেই দিনই প্রথম বোঝা গেল—মানসিক বিকার ভূতনাথ বাবুকে ধরেছে।

গল্প শেষ করলাম। সবিতা উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালো।

আমি উঠে গিয়ে সোজা বললাম ঃ কি বলো, এ গল্প বানানো ? —তুমি বললেও আর আমি বিশ্বাস করবো না। তোমার চোখ বলছে—

এতক্ষণে তাকালাম সবিতাদির দিকে। সবিতাদি কাঁদছে ?

তুমি কি ছেলে-মানুষ সবিতাদি ? সত্যিই বলছি, একদম বানানো গল্প।

বানানো ?—সবিতাদি ধরা গলায় বলে।

হাঁ, সত্যি বানানো।

এবারে সবিতাদি হাসলে। আশ্বস্ত হলাম।

কান্না ও হাসিতে অপরূপ সবিতাদি বললে ঃ সুমিতা নয়, যে মেয়েটিকে তিনি পড়াতেন তার নাম সবিতা গাঙ্গুলী। তোমার সবিতাদি।

ড্রয়ার চাবি দিয়ে খুলে বার করে নিয়ে এল কাল মস্ত একটা বই।

খুলে দিলে আমার সামনে। পড়তে লাগলাম···

আমার নাম ভূতনাথ চক্রবর্তী।······

নয়

পাগল হয়ে যাবার আগে, একজনের লেখার খাতা থেকে এটা পাওয়া যায় ; 'পড়ে দেখো'—বলে ডাক্তার বাড়িয়ে দেন খাতাটা।

হরিশ মুখার্জি রোডের এ মেসটা মন্দ নয়। দুটো তিনটে স্নান ঘর আছে। সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা হল তাই। স্নানের জলের কমতি নেই, অসুবিধে নেই দিনে বার বার স্নানের। মেস নয় ঠিক আপিসের কয়েকবাবু মিলে করেছেন, একটা ফাঁকা সীটে তাঁরা বাইরে থেকে একজনকে নিতে খুব গরজ না দেখালেও আপত্তি করলেন না। প্রথমটা ঘাবড়ে ছিলেন আমি লিখি শুনে। তারপর খুব খুসী হলেন ডিটেকটিভ গল্প লিখি শুনে। বললেন, দেবেন ত স্যার একখানা বইতে নাম লিখে, উপহার দিয়েছেন যেন, দাম দেব আমি, তবে রণদা চক্রবর্তী তাঁর লেখা একখানা বই দিয়েছেন শুনলে বউএর কাছে প্রেষ্টিজ বেড়ে যাবে। আমি বললাম, দেব এক সর্তে, দাম না নিয়েই দেবো, তবে আমার একটা কথা রাখতে হবে আপনাকে ম্যানেজারবাবু।

বলুন, বলুন,—ম্যানেজারের পক্ষে যতটা হাসি মুখে আনা সমীচীন, তার চেয়ে যেন একটু বেশি খরচ হয়ে গেছে বলে, যতটা হেসেছিলেন ঠিক ততটাই গম্ভীর হয়ে বললেন, পসিবল্ হলে নিশ্চয় করব—

ইম্পসিবিল্ কিছু করতে আমিই বা আপনাকে কেন বলব? শুধু কেউ যদি এসে জানতে চায় রণদা চক্রবর্তী এখানে থাকেন কিনা, বেশ কড়া ভাবেই 'না' বলে দরজা দেখিয়ে দেবেন।

'কেন বলুন তো' সন্দেহকে যদি শাণিত তলোয়ারের সঙ্গে তুলনা করা চলত ত বলতুম ম্যানেজারবাবু রীতিমত সন্দেহ করলেন আমাকে খুন করে এসেছি কিনা কাউকে এবং তলোয়ার উঁচিয়ে সন্দেহ নিরসনের জন্যে যেন এগিয়ে এলেন বলে মনে হলো।

"না না কোন মন্দ কাজ করে এসেছি বলে নয়, প্রকাশকদের জানা ঠিকানার বাড়িটা ছেড়ে উঠে এলাম ত শুধু বিশ্রামের জন্যেই। আঠারোখানা বই-এর কণ্ট্রাক্ট ছিলো—এখন কিছুদিন আর লিখতে মন লাগছে না—তাই বলছিলুম—

বুঝেছি বুঝেছি। ম্যানেজারবাবুর মুখ আবার গোল পাউরুটির মত মোলায়েম হয়ে এলো। এই দেখুন কত লোক একটা লেখা ছাপাবার জন্যে হা-পিত্যেশ করে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায় আর আপনি টাকা পাবেন যে লেখার বিনিময়ে তাও লিখতে রাজি নন। ম্যানেজারবাবুর মুখে গাম্ভীর্যের গ্রহণ কেটে গিয়ে এবার পূর্ণিমা রাতের হাসি দেখা দিলো।—আঠারোখানা বই—কত টাকা পেলেন স্যর ?

'টাকা' সে শুনে আর কাজ কি ? বলবার মত নয়—মদ খাইনে, মেয়েমানুষের দোষ যাকে বলে তা নেই। স্ত্রী-পুত্র পরিবার কেউ নেই, তাতেও পেট চালাবার জন্যে আঠারোখানা বই লিখতে হয়েছে আমাকে, নিছক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে।

পোড়া দেশে তবু আর কিছু না করে যে শুধু লিখে চালিয়ে দিলেন এটাই কি কম কথা—রণদাবাবু ? হ্যাঁ ভালো কথা। কথায় কথায় ভুলে যাবো—আপনার আগামটা।

আগাম দিয়ে নিজের ঘরে এসে যখন তক্তপোষে লম্বা হলাম তখন দেওয়ালের ঐ টিকটিকিটা যে একটা ফড়িং ধরে খাচ্ছিল সে ছাড়া আর কেউ নেই। টিকটিকির ডিনারের সঙ্গে শুধু একটা টাইম পিসের টিকটিক ধ্বনি বোধ হয় মিউজিকের অতিরিক্ত আনন্দটুকু জুগিয়ে চলেছিলো।

এসেছিলাম সত্যি করেই অজ্ঞাতবাসের জন্য। উত্তরপাড়ার লোক আমি দক্ষিণপাড়ায় এসেছি একটুখানি মুক্তির জন্যে। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুতে। বহু লোকেই আমার ভাগ্যকে ঈর্ষা করে আমি ছাড়া। আমার ওপর নির্ভর করে এমন কেউ নেই

আমার। চল্লিশ টাকার কেরাণী হয়েও আমার জীবন কেটে যেতে পারতো। কিন্তু খাল কেটে কুমীর আনলো আমার জীবনে পবনকুমার। পবনকুমার আমার গল্পের নায়ক, অজেয় অমর। তাকে প্রত্যেকবার মৃত্যুর গহ্বর থেকে বাঁচিয়ে এনে নবজীবন দান করেছে কে? —আমি। প্রত্যেকবার তার মুখ্যমীর জন্যে শত্রুর জয় যখন অবশ্যম্ভাবী তখনও এক খোঁচায় জয়কে পরাজয়ে মোড় ঘুরিয়ে লক্ষপতির কন্যাকে পবনকুমারের হাতে তুলে দিয়েছে কে?— আমি। মাথায় হাতুড়ী মেরেও ভৈরব দস্যু যে তার প্রাণ বার করতে পারেনি সে কার দয়া—আমার? কে তাকে বাঁচাবার জন্যে ঠিক সময়ে তার সহকারীকে এনে হাজির করে দেয় প্রত্যেকবার—কে সে?—আমি। তবু পবনকুমার আমায় স্বস্তিতে থাকতে দেয় না এক মুহূর্ত। ঘুমিয়ে জেগে সেই এক মানসিক বিভীষিকা— পবনকুমারকে এবার কোথায় নিয়ে যাব বাটাভিয়ায় না ব্লাডিভস্টকে? কোন সিচুয়েসানে তাকে ফেলে আবার বাঁচাব? কি করলে পাঠক আমার বাঁধা ফর্মুলা ধরতে পারবে না? পবনকুমার অকৃতজ্ঞ, সে তার স্রষ্টাকে বিপদে ফেলে আনন্দ পায়। পবনকুমার শুধু বুদ্ধিহীন নয়, বিবেচনাহীন। বেপরোয়া ভাবে ঘুরে বেড়ায়, যেন ধরা পড়লে সব দায়িত্ব শুধু আমারই। গত ন'মাসে আঠারোখানা পবনকুমার লিখেছি আর নয়। আমাকে পাঁচ এডিশনের টাকা একসঙ্গে দিলেও নয়। পবনকুমার কে এখন আমি তা জানিনা, জানতে চাই না। চিনি না, চিনতে চাই না।

মেসের খাওয়াটা খুব খারাপ নয়। ঝোলের বাটিতে ডুবুরী নামালে মাছ হয়ত একটুকরো পাওয়া যায়। নুনের ঘাটতি কিন্তু হলুদ পর্যাপ্ত পরিমাণে রান্নায় উপস্থিত। আর চালে কাঁকর থাকলেও চালের কোয়ালিটি যাতে অখাদ্যের চেয়ে ওপরে না যায় সেই ঐক্য সাবধানে বজায় রেখে চলেছেন ম্যানেজারবাবু। তাই চালের সঙ্গে কাঁকরও খাচ্ছি ভেবে দুঃখ পাওয়ার নেই কিছুই।

পুরোটাই কাঁকর দেওয়ার বৈশিষ্ট্যে—ম্যানেজারবাবুর স্বাতন্ত্র্যও বজায় আছে। তবুও গায়ে মাখলাম না। আমার নায়ক যদি পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সামান্য কাঁকর হজম করতে পারব না আমি? পারব। পারলামও।

শুধু সহ্য কোরতে পারলাম না কালীবাবুকে। সন্ধ্যে বেলায় অফিস থেকে তিনি না ফেরা পর্যন্ত ধারণাই কোরতে পারিনি যে সব সুখ সত্যিই মানুষের কপালে নেই। ভদ্রলোক বদ্ধ উন্মাদ! সত্যি উন্মাদ। গান-পাগলা লোক কালীবাবু। তাঁর গলা দিয়ে যে কোনও দিন সুর বেরোবে না, আমার হাত দিয়ে পবনকুমারের মৃত্যু ঘটানো সম্ভব হলেও আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। সত্যিই। প্রথম দিন তিনি যখন গলা দিয়ে আওয়াজ বার করলেন আমার ঠিক মনে হয়েছিলো বুঝি কাবুলীওয়ালা গান গাইছে। অমন বীভৎস, অমানুষিক আর্তনাদ ক্লোরফর্ম বেরুবার আগেও হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে কেউ শোনেনি। সারগাম করছেন কালীবাবু। চোখ বুঁজে তানপুরো বাগিয়ে সুরের ঝর্ণাধারা ছোটাচ্ছেন তিনি। মানুষ জন্তু কীটপতঙ্গই যে শুধু বিস্মৃত হয়েছেন কালীবাবু তাই নয়। তাঁর চেতনা থেকে যেন পৃথিবীও বিলুপ্ত। সুরের সমাধি শুনেছি কিন্তু অসুরের যে সমাধি হয়, হতে পারে সেদিনই যেন প্রথম অনুভাবনায় এলো।

রাত্তির যত পড়ে অসুরের সুরচর্চা তত সীমা ছাড়ায়। সারা বাড়িটায় কেউ কোথাও নেই। শুধু সেই উন্মত্ত স্বরতাণ্ডব চলছে আমার কানে একটানা। সুর নেই, তাল নেই, লয় নেই। গান শুনলেও যে খুন করবার ইচ্ছে চাপতে পারে এ-অভিজ্ঞতা সেই প্রথম। কিন্তু সেই শেষ নয়। পরের দিন, তারপরের দিন তারও পরের দিন এবং আবার তারও পরের দিন। সেই অবিশ্রান্ত গর্জন, সেই অবিশ্রান্ত বেসুরো গলায় সুরসাধনা। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কষ্ট আমার কষ্টের কাছে কিছুই ছিলো না নিশ্চয়ই।

চতুর্থ না পঞ্চম দিনে ম্যানেজারকে বললাম, কালীপদবাবুর কথা আমায় বলেননি কেন ?

কালীবাবুর কথা, কেন তিনি আপনাকে চিনতে পেরেছেন না কি ? তা এক আধজন ত পারবেই—আপনি খ্যাত—

মুখের কথা মুখেই রইল, আমি ঝাঁকিয়ে উঠলাম ! রাখুন মশাই চেনার কথা, অচেনাতেই কানে তালা লাগিয়ে দিলে, চেনা হলে ত প্রাণে ঘা দিত। না মশাই এর চেয়ে প্রকাশকের পাল্লায় ছিলাম ভালো ! এ-জঞ্জাল বিদায় করুন, নাহয় আমিই বিদায় হই।

ছিঃ ছিঃ ! কি বলছেন ও-ভদ্রলোকের জীবনে আছে কি গান ছাড়া ! মদ নেই, স্ত্রী নেই, অন্য মেয়েছেলে নেই, শুধু নির্দোষ একটু গান।

নির্দোষ কিন্তু দোষের কোন নেশা থাকলে হয়ত উনি একাই মরতেন। এ-নির্দোষ আনন্দ যে আমাদেরো সঙ্গে সঙ্গে মারবে।

কেন ? ও-সময় ত সকলেই বাইরে থাকে—আপনিও না হয় ঠাণ্ডা হওয়ায় একটু বেড়িয়ে আসবেন ?

বাড়ি থেকে পালাবার জন্যে যদি বেরুতে হয় ত বাড়ির বাইরে থাকাই ভাল, বাড়ি কেন তবে ?—আর এসেছিই ত সারাদিনরাত ঘরে বসে অজ্ঞাতবাস করতে।

কিন্তু ওটুকু মাপ করতেই হবে।

মাপ করতাম যদি গলা দিয়ে এক আউন্স সুরও বেরুতো !

বলে রেগে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে। সন্ধ্যে বেলায় বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। বেরিয়ে পড়েই মাথায় এলো পবনকুমার। কালীবাবুর গানের গুঁতোয় পবনকুমারকে ভুলে ছিলাম। এখন আবার আরেক যন্ত্রণা। ঘরে বাইরে দিনের পর দিন ব্যাডমিণ্টন বলের মত দুর্ভাবনার র‍্যাকেটে পিষে মরা ছাড়া যখন উপায় দেখলাম না আর তখন কালীবাবুকে একদিন সোজাসুজি বলব বলেই ঠিক করলাম। কিন্তু এখন ভাবি কেন বললাম। উদোম পাগল লোকটা। বলে সুরের তপস্যা করছি, দেবী প্রসন্ন হয়ে

একদিন নাকি তাঁকে বর দেবেন। তারপর যখন জানালাম তাঁকে যে, সঙ্গীত চর্চা তাঁর পক্ষে পণ্ডশ্রম হচ্ছে মাত্র, শুনে অতবয়সী লোক একটা, বলব কি হাউহাউ করে কেঁদে ফেল্লে। তাঁর মুখ থেকেই শুনলাত সাত বছর ছ'ঘণ্টা করে রেওয়াজ করেছেন কিন্তু তাঁর গান সুরু করা মাত্র লোক পালিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তেরোটা মেস তাঁকে শুধু গান গাইবার অপরাধে ছাড়তে হয়েছে। বুঝলাম সব এবং বললাম না আর কিছুই। কালীবাবু নিজের কানেই সব শুনতে পান এবং নিজের চোখেই দেখতে পান যা দেখবার। কিছুই তাঁর অজানা নেই যে তাঁর গান শুনলে লোকে পাগল হয়ে পালিয়ে যেতে চায়। যদিও যক্ষ্মারোগের মত সংক্রামক নয় কিন্তু মারাত্মক আরো বেশী। আধুনিক চিকিৎসায় যক্ষ্মা আর অনারোগ্য নয় ; দুরারোগ্য মাত্র। কিন্তু এ-গানের পাগলামি কালীবাবুকে খেয়ে এমন জায়গায় তাকে এখন নিয়ে গেছে যা সমস্ত চিকিৎসার বাইরে। কোন চিকিৎসকের করবার এতটুকু কিছুও নেই।

মেস ছাড়লাম না ; কিন্তু পুরী পালিয়ে এলাম। না এসে উপায় ছিলো না। কয়েকদিন সন্ধ্যে বেলায় পরপর কালীবাবুর গোঙানি শুনবার পর তাঁর গানের ভূত আমাকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তুললে। যখন তিনি সত্যি-সত্যি গান গাইছেন না তখনও মনে হচ্ছিল তিনি গান গাইছেন। সন্ধ্যে আসবার অনেক আগে থেকেই আমার সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে যেত। এই বুঝি গান শুরু হয়! পুরীতে এসে প্রথম সন্ধ্যেবেলায় ভারি একটা খুসি লাগল মনে। কালীবাবুর গান নেই। একটা বই নিয়ে বসলাম হোটেলের বারান্দায়। কিন্তু বেশীক্ষণ মন বসাতে পারলাম না বইতে! বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের দিকে। দীর্ঘকাল জ্বরের পর জ্বর ছেড়ে গেলে কিরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। যেন শরীর থেকে ভার কমে গিয়ে বড্ড হালকা লাগে, অথচ সে লঘুত্ব ভারি অস্বস্তিকর। যেন অন্ধ হঠাৎ আবার চোখ ফিরে পেয়েছে। যে আলো তার কাম্য

ছিলো সেই আলোকেই সে যেন সহ্য করতে অক্ষম। নাঃ। অস্বস্তির ভাবটা ক্রমশ আমাকে পেয়ে বসল। কালীবাবুর গানই যেন ভাল ছিলো। কালীবাবু বিহীন হোটেল মনে হতে লাগল যেন বিপত্নীকের খাটের মত। স্ত্রী থাকতে যে জ্বলেছে অথচ স্ত্রী আজ নেই বলে একা শয্যায় শুয়ে থাকতে যার কেবলি মনে হচ্ছে আজ সে পাশে থাকলেই ভালো ছিলো।

দুদিন কি তিনদিন। না, কালীবাবুর গান আমায় যেমন পাগল করেছিলো কালীবাবুর গান না গাওয়াও আমাকে পাগল করলে দেখছি। পুরী থেকে আবার ফিরে এলাম সেই মেসে। যখন মেসে পৌঁছলাম তখন সবাই কাজে চলে গেছে, ম্যানেজারবাবুও নেই। ওপরে এসে কালীবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে নিজের ঘরে আসতে দেখি তাঁর ঘর চূনকাম করা হচ্ছে। একটু অবাক হলাম। চাকরটাকে জিজ্ঞেস করলাম, কালীবাবুর ঘর চূনকাম হচ্ছে কেন রে?

চাকরটা বলেঃ কালীবাবু মারা গেছেন বাবু—তাই—

নিজের হৃৎপিণ্ডও বন্ধ হয়ে গেছে মনে হোল! মারা গেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি যেদিন গেলেন সেইদিন রাত্তিরে শুলেন খেয়ে-দেয়ে—সকালে আর উঠলেন না।

সন্ধ্যে বেলায় ম্যানেজারবাবু যখন বললেনঃ যা চেয়েছিলেন তাই হোল, আর কালীবাবুর গান নেই—এবার আপনি নিশ্চিন্ত, তখন ইচ্ছে হোল ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিই তাঁর গালে। কিন্তু কেন যে এমন ইচ্ছে হোল কে জানে?…

দশ

ডাক্তার বলে যাচ্ছিলেন—

প্রায়ই একটা জিনিষ আমায় আকর্ষণ করে। জিনিষটা আর কিছুই নয়, নানান পত্র-পত্রিকায় ছাপা একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয়ঃ 'আপনার দেখা বিচিত্র মানুষ'। আমি নিজে মোটেই প্রবন্ধ পড়তে পারিনে বলে নয়, ব্যাপারটা হাস্যকর ঠেকে শুধু এই কারণে যে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধকার 'বিচিত্র মানুষ' বলতেই ধরে নেন কোনও মহৎ মানুষ; অর্থাৎ তাঁর প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি যাকে অতি সামান্য একজন অখ্যাত লোক বলে দাঁড় করান, প্রবন্ধ শেষ হবার আগেই তাকে দিয়ে তিনি এমন কোন অসামান্য কাজ করিয়ে নেন যে পাঠকের চোখ হয় অশ্রুসজল, পাঠিকার রুমাল—ভিজে। একবাক্যে যে পড়ে, সেই বলে 'সাবাস' একেই বলে অভিজ্ঞতা।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেয়েও বিচিত্র কিছুই কি সত্যিই নেই? মানুষ কি নির্ভেজাল ভালো হয়? কিংবা নিখাদ সোনার মত মন্দ? এক মুহূর্ত আগেও যাকে মনে মনে দেবতা বলে নমস্কার করেছেন পরের মুহূর্তেই হয়ত সে এমন কিছু কাজ করে বসল যার থেকে তার চেহারার সঙ্গে শয়তানের অবয়বের তফাৎ করা মুস্কিল হয়ে পড়ে হয়ত আপনারই। বাইরে থেকে যাদের দেখে মনে হয় ভারি ভালোমানুষ, তাদের মনের সমস্ত চিন্তা যদি আপনি পড়তে পারেন, নির্মল মুখের নীচে কত কদর্য কথা আর শান্ত দুটি চোখের তলায় কি হিংস্র দৃষ্টি মানুষের হতে পারে তার নজীর দেখে আপনি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। মন্দ চরিত্রের মানুষ যে অবস্থায় পড়ে মন্দ কাজ করতে বাধ্য হয় যদি পুরোপুরি তার পারিপার্শ্বিক আপনার জানা সম্ভব হোত, যদি আপনার এমন কোন উপায় জানা থাকত যাতে পরের মনের প্রত্যেকটি চলাফেরার প্রতিটি মোড় নেওয়ার পেছনে কোন বৃত্তি কাজ করছে জানা সম্ভব হোত, তাহলে দেখতেন

তার কাজে 'ছি' বলবার আগে দুবার থেমে তারপর কোন মত না দিয়ে নীরব হওয়া ছাড়া আপনার গত্যন্তর ছিলো না। মানুষ একটানা মহৎ নয়, অবিকল মন্দও নয়, টুকরো টুকরো ঘটনার জোড়াতালি দেওয়া জীব সে।

এমনিই বিচিত্র কি না জানিনে একজন, যে মানুষের কথা আমি কখনো ভুলতে পারিনে, সে হোল চৌধুরী সাহেব ওরফে নন্দ চৌধুরী। নন্দ চৌধুরীকে আপনারা অনেকেই চিনবেন, শেষ স্বদেশী এক্সিবিসন যেবার কলকাতায় বসে সেবার নন্দ চৌধুরীকে দেখতে যাননি এমন কেউ যদি আপনাদের মধ্যে থাকেন ত সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলব আপনি কি হারিয়েছেন আপনি জানেন না। সেই শেষ স্বদেশী এক্সিবিসনে নন্দ চৌধুরী সংখ্যাহীন বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে জীবন্ত কাঁচা পাঠা খেয়েছিল একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে, যেমন কেউ খুব প্রিয় কোন জিনিষ ভোগ করে খুব ভয়ে ভয়ে বুঝি এই ফুরিয়ে গেল, এইবুঝি আর রইল না। এক্সিবিসনে লোক আসে কিনতে নয়, স্বদেশী বস্তুর প্রতি প্রেমে পড়ে নয়, আসে আদিম পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চোখ দিয়ে। নন্দ চৌধুরী খায় কাঁচা পাঠা, কিন্তু লালা নিঃসরণ হয় জামা কাপড়ের তলায় আদিম মানুষ যে তার জিব থেকে।

নন্দ চৌধুরীর বিখ্যাত তালি দেওয়া প্যাণ্টের জন্য, তাকে আমরা, আমরা মানে তার ঘনিষ্ট পরিচিতেরা তাকে ডাকতাম, চৌধুরীসাহেব বলে। সাহেব বললে সে ভারি খুসি হোত। বুনো জানোয়ারের মত কদাকার আর কালো, আর হিংস্র ভয়ঙ্কর তার মুখে সাহেব কথাটা এনগ্রেভ করে দিতো একটু-সময়ের খুসী। সেই এক্সিবিসন চলবার সময়ই কোন কোন দৈনিকে বেরিয়েছিল তার মুখের অনুকৃতি, ৫৫ স্ক্রীনের হাফটোনে, বিলেতি কাগজেও। আর সেই ছবির সঙ্গেই ছিলো আরেক টুকরো আরও ছোট খবর: নন্দ চৌধুরী অসুস্থ। এই অসুস্থতার পর নন্দ চৌধুরীকে আর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে

কোনও দিন দেখা যায়নি, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও কোনও খবর দিতে সক্ষম হয়নি। তারপর এক সময়ে সকলেরই অনুসন্ধিৎসায় ভাঁটা এলো। আমিও ভুলে গেলাম চৌধুরী সাহেবকে।

উনিশশো তিরিশ সালের জানুয়ারী মাসে আমি পনেরো দিন রাঁচীতে কাটাই। মা মারা গিয়েছিলেন সেই জানুয়ারী মাসেই। রাঁচীতে মায়ের নামে একখানা বাড়ি ছিলো দাদামশায়ের দেওয়া। পারিবারিক ঝড়-ঝাপটায় সে বাড়ি বহুকাল আগেই বিক্রী হয়ে যায়। আমরা চিরকাল তার গল্পই শুনে এসেছি চোখে দেখিনি কখনো। সেবার রাঁচী যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিলো তাই, এবং সেই সঙ্গে বিশ্রামের দরকারও ছিলো বড় বেশী। ফিরে আসবার চরিদিন আগে গিয়েছিলাম বাসে করে কাঁকের পাগলা গারদ দেখতে।

পাগলা গারদে ঢুকেছিলাম যত উত্তেজনা নিয়ে, ভেতরে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে তা নিভে গেল। পাগলদের মধ্যেও সাদা কালো আলাদা করে রাখা আছে। পাছে কালো পাগলদের ছোঁয়ায় সাদা পাগলদের মাথা ঠিক হয়ে যায়, বোধ করি এই ভয়ে। কয়েকটি মেয়ে পাগল নিয়ে একটি ঘর। ঢুকে মনে হোল কোনও রূপকথার পৃথিবীতে বুঝি এসে পৌঁছলাম। কোন বিস্মৃতির দণ্ডে কারা বুঝি বোবা হয়ে আছে অনন্তকাল। স্মৃতির রাজকন্যাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে কোন পাগলা দৈত্য। চোখের চাওয়া আছে। দৃষ্টি নেই। ঘর থেকে বেরিয়েই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। দরজার পাশে এক পাটি চটি নিয়ে যে দাঁড়িয়ে সে বুঝি কোন প্রেতপুরীর বাসিন্দা। কৃষ্ণ পাগলদের দেখে যখন ফিরছি তখন একটি চীৎকার কানে এলো: একটা বিড়ি দেবেন স্যার? বিড়ি?—শুনে শুনে কান ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তবুও মজা দেখবার জন্যে একবার ঘুরে দাঁড়ালাম। ফিরে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। হাজার চেষ্টা করেও মুখ চেপে ধরতে পারলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: চৌধুরী সাহেব?

খুশী উড়ে গেল নিমেষে। রাগে গালাগাল দিতে দিতে ফিরে চলল পাগল। সঙ্গের গার্ড জিজ্ঞেস করলো, চৌধুরী সাহেবকে চেনেন না কি? হাসলাম। চৌধুরী সাহেবকে চিনি? না, সত্যিই এ চৌধুরী সাহেবকে ত চিনি না। আমি যাকে চিনতাম—সে ছিলো অন্যরকম পাগল।

আমাদের আলাপ ইজের-পরা বয়স থেকে। কিংবা তারও আগে। তখন চৌধুরী সাহেব ওরফে নন্দ চৌধুরী আমাদের কাছে আমাদের নন্দা। নন্দাকে প্রথম ভয় করতে শিখি নন্দাদের বাড়ি খেলতে গিয়ে। গেটে ঢোকা মাত্র নন্দার চীৎকারঃ মজা দেখ গোকুল। চোখ তুলে দেখি তেতলার ছাদে নন্দা বাচ্চা বেড়াল নিয়ে খেলছে, খেলা সাঙ্গ হয় অল্পেই। নন্দা এক সময় ফেলে দিলে বাচ্চাটাকে। ফেলে দিলে বল্লাম, ভুল বল্লাম। সেখান থেকে আছাড় দিল মার্জারককে। মাটিতে পায়ের প্যাড পেতে দিতে পারলে না ঠিকমতো। ঘাড়টা মটকে গেলো। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো। কী বীভৎস চীৎকার! পুরো আধ ঘণ্টা বাচ্চাটা চীৎকার করে তারপর থামলো আর আওয়াজ করলো না। বেড়ালের কান্না থামল, শুরু হোল নন্দার হাসি। না ভোলবার মত যদি কিছু সেই সাত বছর বয়সে সঞ্চয় করে থাকি, ত সেই একটা স্মৃতি দাগ কেটে বসে গেছে আমার কচি মনে। কিন্তু নন্দার যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাবে হিড় হিড় করে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্লঃ চল, চল খেলবি চল। ওটাকে জমাদার নিয়ে যাবে অখন। তারপর বড় হয়েও এই নিয়ে মনে মনে অনেক জাল বুনেছি যাকে আপনারা বলেন বিশ্লেষণ। ওরা বলে এ্যানালিসিস। শেষ সিদ্ধান্তে যা এসেছি তাহোল নন্দা সুস্থ নয়। এবং একদিন বিশেষজ্ঞদের সায় থেকেই জানতে পারলাম চৌধুরী সাহেব সত্যই মানসিক অসুস্থ। কিন্তু মাঝের কটা ঘটনা কোন অসুস্থ লোকের পক্ষেও বুঝি অকল্পনীয়।

নন্দাকে দ্বিতীয়বারে যে ভাবে দেখলাম তা আরোও অসম্ভব।

আরো ভয়াবহ। গ্রীষ্মের ছুটির দুপুরে নন্দার ওখানে গেছি। নন্দার মা বল্লেন নন্দা তেতলায়। বাচ্চাদের নিয়ে কি যেন করছে, তুমি ওপোরে যাও। গিয়ে যা দেখলাম তাতে আজ মনে হয় সেখানে না যাওয়াই ছিলো উচিত। চারদিকের ছোট ভাই আর বোনেদের মাঝখানে নন্দা বসেছে রাজার মত। একটা দড়িতে পাগুলো বেঁধে একটা ইঁদুরকে ধরে বসে আছে আঃ একজন ভাই। নন্দা তার গায়ে ফোটাচ্ছে একটা বড় ছুঁচ। ছোটরা হাত তালি দিচ্ছে। ইঁদুরটা চেঁচাচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে টিনের ওপর ধারালো কিছু দিয়ে যেন কেউ ঘসছে। সমস্ত শিরায় কে যেন ছুরির ফালা দিয়ে বিঁধিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নন্দা নির্বিকার বুদ্ধের মত বসে। আর ছুঁচ ফুটিয়ে চলেছে পেটে, ল্যাজে, চোখের নীচে। দুহাত দিয়ে নিজের চোখ দুটোকে ঢেকে ফেলবার আগে ইঁদুরটাকে শেষবারের মত দেখলাম। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত এসে পড়ছে ঠোঁটের ওপর আর ঠোঁট দিয়ে তা চুষছে গনেশবাহন। ইঁদুরের কান্না আর নন্দার হাসি। নন্দাকে ঠিক মনে হোল কেউ না থাকলে বোধ হয় ইঁদুরটাকে খেয়ে ফেলে চিবিয়ে ; খুব সুস্বাদু খাবার পেলে জিব যেমন সিক্ত হয়ে ওঠে ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে যায়, ইঁদুরটার সামনে বসা নন্দাকে ঠিক তেমন মনে হোল। নন্দা আমাকে নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে বলে গেল, তোরা খেল, আমি আসছি।

এরপর শিকারের নেশায় পেয়ে বসল নন্দাকে। কোত্থেকে জোগাড় করলো একটা এয়ার গান। ছররা আপনি এসে হাজির হোল। তারপর কিছুদিন আর নন্দাকে চান করতে দেখলে না কেউ, খেতে এলো না বিকেলের আগে। ক্লাসে দেখা গেল না, তখন নন্দার মা বল্লেন, দে বাবা, ওকে কিছুদিন ঐ নিয়েই থাকতে দে। ঝোঁক যেমন এসেছে আবার চলেও যাবে তেমনি।

কিন্তু একদিন বেলা চারটের সময় নন্দার ছোট ভাই এলো হন্তদন্ত হয়ে। দাদা এখনোও বাড়ি ফেরেনি, মা কান্নাকাটি করছেন।

আপনি চলুন। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য কোনও জায়গায় যখন নন্দাকে পাওয়া গেল না এবং হাল আমরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন কে এসে যেন খবর দিলে ঘোষেদের বাগানে নন্দাকে দেখা গেছে।

ঘোষেদের বাগান বাড়িতে নন্দাকে সত্যিই পাওয়া গেল। ঘোষেদের বদমায়েস ছেলেটাকেও। গিয়ে দেখি একটা চড়াই ছটফট করছে। নন্দ একফোটা জল দিচ্ছে ওর ঠোঁটে আর তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে দেখছে। জল পেয়ে পাখীটা যত আরোও জলের জন্যে হাঁ করে, নন্দা তত জল না দিয়ে মজা দেখে। তারপর এক সময়ে চড়াইটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খতম হয়ে গেল ছটফটানি। নন্দা তখন উঠে সমস্ত জলটা উপুড় করে দিল চড়াইটার ঠোঁটের ওপর। বল্লে, খা কত খাবি এবার। হা হা করে হেসে উঠল ঘোষেদের বদমাইস ছেলেটা।

সতেরো বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দিলো নন্দা, বিয়ে করলো আঠারোয়। নন্দার মাকে পাড়ার পাঁচজন বুঝোলে লেখাপড়া হবে না নন্দার, আর লেখাপড়ার দরকারই বা কি ? একটা ছেলে, চলে যাবে যেমন তেমন করে হোক কিন্তু ভয় হচ্ছে ওর বাতিক নিয়ে। মানুষের চেহারায় জানোয়ারের প্রকৃতি বরদাস্ত হবেনা কিছুতেই। অতএব বিয়ে দিয়ে দাও নন্দার। কথাটা মনে ধরলো নন্দার মায়ের এবং সত্যিসত্যি নন্দার বউভাতে আমরা খেয়ে এলাম।

বিয়ে দিলে কোনো ব্যামো সারে এ বিশ্বাস করবার কোন কারণ না থাকা সত্বেও আমাদের মনেও যে কোন miracle কখনো কখনো উঁকি ঝুঁকি না মারত তা নয়। ভাবতাম বিয়ের জল পড়লেই নন্দার মনের গ্র্যানাইট একটু নরম হবে, তার উৎকট পৈশাচিক প্রবৃত্তিতে একটু একটু করে ফাটল ধরবে। স্ত্রীর প্রেমের সবুজ নীল ছায়া পড়বে রৌদ্ররুক্ষ নন্দার মনের মাটিতে, তারপর ছেলেপুলে হলে অসন্তোষের অজগর মুখ লুকোবে অন্ধকার বিবরে। আত্মজ যখন প্রথম ছুটতে গিয়ে আহত হবে, বাধা পাবে দাঁড়াতে শিখে, তখন

থেকেই অন্তর্হিত হতে থাকবে অসহায় পশুবকদের অকারণ আঘাত কোরে নিষ্ঠুর আনন্দ পাবার বীভৎস লিপ্সা!

কিন্তু কোনো কোনো মাঠকে দূর থেকেই সবুজ দেখায় মাত্র; কাছে এলেই রঙ ছুটে যায়, মনে হয় নিঃসন্তান বিধবার বুকের মতো শুকনো নীরস ব্যর্থ। কামনায় জর্জরিত যে পতিহীনা সমাজের অনুশাসনকে ভয় করে স্বাভাবিক পথে মেটাতে পারেনি মনের কামনা, নিজের পুত্রবধূকে অন্যায় সন্দেহ করে, ছোটখাট ত্রুটির তিল থেকে মহাপরাধের প্রকাণ্ড তাল রচনা করে চরিতার্থ হতে চেয়েছে যে, প্রতি মুহূর্তে নিজের এবং তার জীবন বিষময় করে, তার সেই বিকৃত মনের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হোল উৎকট অবিচারী পাশব প্রবৃত্তি। ফুলশয্যা পেরোতে না পেরোতে একদিন রাত্তিরে ঘুমন্ত বৌয়ের চুল কেটে ফেললে নন্দা আর সকালে বললে ক্রন্দন নীরব নূতন বৌকে, আমি মারা গেলে সেই তো চুল কেটে ফেলতে হবেই, আগে থেকে কেমন দেখায় তাই জেনে গেলাম। শ্বশুর বাড়িতে খবর গেলো জামাই পাগল। বৌয়ের হাতে, পায়ের নখে সারা রাত্তির জাগিয়ে রেখে ছুঁচ ফুটিয়ে চললো নন্দা: আমি পাগল—যন্ত্রণায় যেটুকু শান্তি চীৎকারে, নন্দার বৌ সেটুকু শান্তিও আর জীবনে কখনও খুঁজবেনা এই প্রতিশ্রুতিতে কিছুটা আর কিছু নিজের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো নন্দা ভোরের দিকে। জেগে রইল ঘরের দাওয়ায় মুখে দগদগে ঘা নিয়ে আধ পাগলা খেঁকিকুত্তা আর ঘুম এলো না ঘরের মেঝেয় স্বামী-প্রেমতৃপ্তার আরক্তনয়নে।

পেটের ছেলেকে ভ্রূণ অবস্থায় কেমন দেখায় এই অত্যন্ত অদ্ভুত কিন্তু নন্দার কাছে স্বাভাবিক বাসনার কথা নন্দার বৌ যেদিন জানতে পারলো সেদিন কিছুতেই তাকে আর চুপ করানো গেল না, কিন্তু ঘর জাগাবার আগেই নন্দা তাকে চীৎ করে ফেললে; বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে মুখ হাঁ করে জোর করে টেনে ধরলে জিব এবং তারপর আর কি হোল আমরা জানিনে, নন্দার বৌ আর কথা কয়না, চেষ্টা করলেও

আর পারেনা কথা কইতে শুধু একটা অবোধ হাঁউ মাউ আওয়াজ শুনে নন্দা ভারী মজা করে হাসে।

এরপর ঘেন্নায় নন্দার মুখ থেকে মুখ ফিরিয়েছি। আমরা খবর পেয়েছি ছেলেকে পৃথিবীতে রেখে দিয়ে নন্দার বৌ বেঁচে যাবার জন্যে বেছে নিয়েছে গলায় দড়ি আর বঞ্চিত করেছে নন্দাকে গলা টিপে মেরে ফেলবার দুর্লভ সুযোগ থেকে। নন্দার মা কোথায় চলে গেছেন। নন্দা কি করতে কলকাতায় গেছে বিপুল বিতৃষ্ণায় তার কোন হদিশ নেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। কিন্তু নিলে এ-গল্প আরও সম্পূর্ণাঙ্গ হতো—এ অভিজ্ঞতা হতো বিচিত্র। কাঁকের ডাক্তারের কাছেই খবর পেলুম নন্দাকে সেখানে দিয়ে গেছে তার এক বড়লোক পিসীমা; কলকাতায় সিমলা ষ্ট্রীটের নন্দা ছাড়া নিজের বলতে যার আর কেউ নেই। কলকাতায় ফিরে সিমলা ষ্ট্রীটে সেই ঠিকানা বার করতে দেরী হোল না, দেরী হোল নন্দার পিসিমাকে দিয়ে নন্দার পাগল হয়ে যাবার ঠিক্ আগে কি কি ঘটনা ঘটেছিল তারই টুকরো টুকরো ঘটনা বলাতে। নন্দার ভাবনার কিছু ছিলোনা। খেতদেত্তো ঘুমোত। পিসিমাও নিশ্চিন্ত ছিলেন, জানতেন না নন্দার অভাব কোথায়। শুধু এক একদিন অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতো পিসিমার। নন্দার ঘরের দরজা ফাঁক করে দেখতেন ঘুমের ঘোরে দাঁত কিড়মিড় করছে। এত নন্দা নয়, কোন নরখাদক। এই সময় নন্দার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে একটু একটু করে আফিঙের নেশা ধরা আর একটি নন্দার পিসিমা তখনও যা জানতেন না এখন জানেন, হাজার হাজার লোকের সামনে কাঁচা পাঁঠা বা মুরগী খেয়ে দেখানো। কয়েক দিন যাতায়াতের পর যখন পাগলামির কোনো সূত্র খুঁজে বার করতে পারলুম না তখন পিসিমাকে একদিন স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলাম পাগল হবার ঠিক আগে নন্দা কারুর কাছ থেকে কোনো আঘাত পেয়েছিলো কিনা। পিসিমা হেসে জবাব দিলেন আঘাত ত সে কারুর কাছ থেকে

পেতোনা, দিতেই ভালবাস্‌তো তবে—। কি? আমি চমকে উঠলাম। একটা ঘটনা ঘটেছিল, পিসিমার গলায় যেন বিশ্বাস করবার মতো নয় এমন স্বর, আমার মনে হয় সেটা কোন কারণ নয়। ডুবে যাবার আগে শেষ কুটোটা ধরবার আপ্রাণ চেষ্টায় আওয়াজ করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মনে যাই হোক না হোক আপনি বলুন। পিসিমা যা বলে গেলেন তা গল্প কিনা জানিনে কিন্তু বানানো নয়। সেই সময়টা নন্দা বিকেলের দিকে বাড়ির মধ্যে একটা একটু বাগানের মতো জায়গায় একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে তারিয়ে তারিয়ে একটু একটু করে আফিঙ খেতো। একদিন কোথা থেকে একটা ব্যাঙের বাচ্চা থপথপ করে সেখানে এসে হাজির হোল আর নন্দা টপ করে তার হাঁয়ের মধ্যে একটু আফিঙ ফেলে দিলো, তারপর রোজ সেই ব্যাঙ আসে থপথপ করে আর নন্দা একটু একটু করে আফিঙ ধরায় তাকে।

হ্যাঁরে, রোজ ওকে আফিঙ খাইয়ে খাইয়ে নেশা ধরিয়ে দিচ্চিস, এরপর ওকি দোকান থেকে কিনে খাবে? কেন পিসিমা? ওর তো দোকানের দরকার নেই, আফিঙ দরকার হোলে আমার কাছ থেকেই পাবে। নন্দার জবাব শুনে পিসিমা হেসে চলে গেলেন।

পিসিমার সাক্ষ্যে প্রকাশ, এই সময় নন্দার চেহারা একটু একটু করে বদলাতে লাগলো। রাতে দাঁতের কিড়মিড় বন্ধ হয়ে এলো। নরখাদকের মুখে ছায়া নামলো অপত্যের। সেই সময় রোজ কারা আসত নন্দাকে কোথায় নিয়ে যাবার জন্যে, নন্দা যেতে চাইত না। দরাদরি থেকে কথা কাটাকাটি হোতো, শেষ পর্যন্ত কলহ। পিসিমা এখন বোঝেন যারা আসত তারা মেলার লোক। নন্দাকে দিয়ে কাঁচা পাঠা মুরগী খাইয়ে দুপয়সা রোজগার হতো তাদের। নন্দার অস্বীকৃতিকে তারা মনে করতো ওর দাম বাড়াবার কৌশল বলে। নন্দা তাদের সঙ্গে কখনও কখনও গেলেও ফিরে আসতো সন্ধ্যে হবার আগেই, যখন অন্ধকার নামতো মাঠের ওপর আর থপথপ করে

আসতো সেই ব্যাঙের বাচ্চা নন্দার নেশার ভাগীদার। সারাদিন উদগ্র হয়ে থাকতো সমগ্র স্নায়ুকোষ সেই সময়টুকুর জন্যে। তারপর একদিন নন্দা রাত্তির বেলায় বেরিয়ে কোথায় যেন গেল, ফিরলনা পরের দিন বিকেলেও। ডেকে ডেকে ব্যাঙের বাচ্চা পড়ে রইলো সেই মাটিতে মুখ থুবড়ে। তারপরদিন বিকেলেও নন্দার পাত্তা নেই। এলো তৃতীয় দিন সকালে গায়ে ১০৪ উত্তাপ নিয়ে, চোখ খুলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল তার পিসিমাকে, জিজ্ঞেস করলো সে অনেক আশা নিয়ে উচ্চ কণ্ঠেঃ আমার ব্যাং ?

সে তোমার আফিং না পেয়ে মরেছিল, ফেলে দিয়েছি তুলে—যতসব অনাছিষ্টি কাণ্ড তোর !

এর পরেই নন্দ পাগল হয়ে যায় !

বাইরে কখন তারায় তারায় আকাশ ভরে গেছে ; আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে ঘরে টের পাই নি। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর যেন দূর কোন সমুদ্রের বিষণ্ণ নাবিকের গান। থেমে যাবার পরেও থেমে যায় না কিছুতেই। সে গানের অশেষ রেশ রিমঝিম করে বাজতে থাকে প্রাণের কাণে। গল্প শেষ করে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। চলে যাবার ইঙ্গিত। আমিও গুডবায় করলাম ডাক্তারকে, সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের সন্ধ্যার মতো।

বাইরে নিওনসাইনে নীল কলকাতার গায়ে অসংখ্য বিজ্ঞাপনের প্রজাপতির রংবাহার কোথাও ; কোথাও জোনাকির টিপটিপা গাড়ির হর্ণ, ফেরিওলার চীৎকার ! বেলফুল চাই বাবু ? বেলফুল চাই ?

চাই সকলকেই। চাই না কেবল পাগলকে। দূরে সরিয়ে রেখে দিতে চাই তাদের গরাদের ওদিকে। 'তারা যে কেহই না গো, কিছুই নয় !

এগারো

হঠাৎ দেখলে অবাক না হয়ে উপায় নেই।

মাথায় পাঁচ ফিটের কিঞ্চিৎ কম। কোমরের ওপর থেকে উন্মুক্ত অর্ধাঙ্গ বিস্তৃতিতে মানুষের কল্পনার শেষ সীমা ছাড়িয়েছে। লোমষ কালো উদরের স্ফীতি ভয়াবহ। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হয় বুঝি এখনই ফেটে পড়বে। দূর থেকে কৃষ্ণবরণ একটি জালাকে নড়তে দেখবার পর অবশ্য ভুল ভেঙ্গে যায়। কাছে এলে তবে দুটি অত্যন্ত ছোটো চোখ নজরে পড়ে। প্রায় সমতল নাকের সীমানা সমস্ত মুখ ব্যেপে ছড়িয়ে থেকে গঙ্গারামের চেহারাকে একটা অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

মানুষের শরীরে যে এত চর্বি জমতে পারে শুধু চোখে দেখলে যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না। বোধ করি সেই কারণেই কাছ থেকে গঙ্গারামকে দেখবার জন্যে দক্ষিণা দিতে কারুর কার্পণ্য নেই। এমন কি কলকাতার মতো শহরে যেখানে বাহুল্যের জন্যে বৈচিত্র্যকেও অতি সাধারণ, একেবারেই গতানুগতিক বলে সন্দেহ করা অসম্ভব নয়, সেই রাজধানীর ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, অগণিত মহিলা ও পুরুষের অবিরাম পৃষ্ঠপোষকতা-ধন্য 'মেরিলি বোর্ণ ক্যার্নিভ্যালের' অন্যান্য আয়োজন কানা করে দিয়েছে একা গঙ্গারাম। আয়োজন, আয়তন ও বৈচিত্র্যে বিপুল। কাষ্ঠনির্মিত ঘুরন্ত অশ্বের পৃষ্ঠে চড়বার দুরন্ত দুর্নিবার বাসনা বা নাগরদোলা কিম্বা ছোটো ছোটো গাড়িতে ঘুরবার নেশায় আচ্ছন্ন হয়েই ছেলে-মেয়েরা ক্যার্নিভ্যালে আসে ঠিক; কিন্তু গঙ্গারামের ঘরের মধ্যে ঢুকলে সহজে তাদেরও বার করা শক্ত যে একথাও তো বেঠিক নয়। আর নূতনতম ফ্যাসানের জয়ধ্বজা উড্ডীন যাদের অঙ্গজুড়ে সেই স্ট্রিমলাইনড্ তরুণীরাও কি এক যাদুমন্ত্রে আটকা পড়ে গিয়ে

অমৃতহ্রদে পতিত মক্ষিকার মতো আর বেরুবার জন্যে পা তুললেও মন তুলে নিতে পারেন না। এবং সেই সব বিদুষীদের আসলে যাঁরা বডিগার্ড মাত্র, নামে হাসব্যাণ্ড বা বয়ফ্রেণ্ড, যাই হোক না কেন, মহিলাদের সঙ্গে যাঁরা ক্যার্নিভ্যালে আসতে বাধ্য হন তাঁরা মুখে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও ওই এক যাদুমন্ত্রে আটকা পড়েন গঙ্গারামের তাঁবুতেই। এমন কি ক্যার্নিভ্যালের মুখ্য আকর্ষণ যে জুয়ার আড্‌ডা—তাও যেন, যেন কেন নিশ্চয়ই কানা হয়ে গেছে এক গঙ্গারামের প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রবলতর আকর্ষণের প্রতাপান্বিত মহিমায়।

মেরিলিবোর্ণ ক্যার্নিভ্যাল যেমন আসলে এই মেলার নাম নয় তেমনই সুবিমল দাস নাম ভাঁড়িয়ে এই ক্যার্নিভ্যালের গঙ্গারামে পরিণত হয়েছে। কল্যাণপুর গ্রামের হরদয়াল সাহার মেলা বহু গ্রাম ঘুরে, উপসহর পাড়ি দিয়ে যেই রাজধানীতে আসর জমাতে বসেছে সেই প্রয়োজন হয়েছে সাইনবোর্ড পালটাবার ; সাইনবোর্ডে নাম পালটাবার। কারণ? কারণ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কারণ, সেক্সপীয়ার যতই বলুন, নামে কিছুই এসে যায় না, নামে এসে যায়! কলকাতার মতো শহরে সবচেয়ে বেশি আসে যায় নামেই। নামৈব কেবলম্‌। নাম ছাড়া কলিতে নয় কেবল, কলিকাতাতেও কিছু করা অসম্ভব। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মক্কা এই কলকাতায় সাহার মেলা শুনে নাক সিঁটকোবে যারা, মেরিলিবোর্ণ ক্যার্নিভ্যাল শুনলে আসবার জন্যে তাদেরই মনের জিভ দিয়ে লাল পড়বে যে তা শহর থেকে অনেক দূরে বসেও হরদয়াল সাহা জানতেন। সাহার মেলায় ঢোকবার জন্যে দু-আনা দিতে বাধবে যাদের, মেরিলিবোর্ণ ক্যার্নিভ্যালে দু-টাকা খরচা করতে পেরে নিজেদের কৃতার্থ মনে করবে সেই তারাই যারা ফুটপাথের ছ-আনার রুমাল 'হলএণ্ড' থেকে দেড় টাকায় কিনে নিজেদের বুদ্ধিমান বিবেচনা করে।

কিন্তু মেরিলিবোর্ণ ক্যার্নিভ্যাল এলিয়াস হরদয়াল সাহার মেলায় সেবার বোধ হয় অন্যান্য আয়োজন না হলেও চলতো। হরদয়াল সাহা স্বয়ং এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হন গঙ্গারামের তাঁবুতে ভীড়ের বহর দেখে ; তাই মনে করেন। কে জানত সৌখীন আর রুচিবাগীশ কলকাতার বাবুরা মোটা গঙ্গারামকে দেখবার জন্য গরমে ভীড় ঘেঁষা-ঘেষি উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে। অসম্ভবই বা কেন ? অন্যান্য যা আয়োজন শহরে তার এত বাহুল্য যে, হয়ত এদের চোখ থেকে তাদের নেশা টুটে গেছে। কিম্বা মানুষের দৈহিক বিকৃতিতে মানুষ যত আনন্দ পায় অন্য আর কিছুতেই তা সম্ভব নয়। খোঁড়া অথবা কালা, কিম্বা চার হাত অথবা তিন পা, মানুষ নিজে যার জন্য বিধাতাকে অভিশাপ দেয়, অন্য মানুষেরা প্রাণ দিয়ে হয়ত তাই উপভোগ করে। গঙ্গারামের তাঁবু থেকে ফিরেই হরদয়াল আজ নিজে বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে বসে। ভুল হয়েছে ; মস্ত ভুল। ঘোড়া নাগরদোলা আর নয় শুধু "মোটা মানুষের" বিজ্ঞাপন দিতে হবে জোরালো ভাষায় চমকপ্রদ বিশেষণ। "মোটা মানুষ", "মোটা মানুষ", "মোটা মানুষ"—নিজে এসে দেখে যান। "প্রকৃতির পরিহাস, বিধাতার সৃষ্টি।" কাগজে ঘোড়ার গাড়িতে ব্যাণ্ডের সাহায্যে হ্যাণ্ডবিল আর পোস্টারে কলকাতার পথের ওপর আওয়াজ দিয়ে ফিরতে থাকে 'মেরিলিবোর্ণ ক্যার্নিভ্যালে'র মোটা গঙ্গারামের বিচিত্র ইতিহাস। দিনের পর দিন ভিড় বাড়ছে। ছোট্ট একটুখানি ঘরের বাইরে বাঁশ দিয়ে সীমানা করা হয়েছে। মাথার ওপর একটুখানি ঢাকা। সেই প্রায় উন্মুক্ত স্থানে সহস্র বিস্তারিত নয়নের দৃষ্টির সামনে স্থির হয়ে বুদ্ধের মত বসে আছে গঙ্গারাম। সকলের চোখে আশ্চর্য কৌতুক। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন কাঠি দিয়ে গঙ্গারামকে খোঁচা দিল—"তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন ?"

একটি বিপুল অট্টহাসির শব্দে মাথার ওপরের চাপ খসে পড়বার

উপক্রম। "এই ওকে আজ খুঁচিও না"—ক্যার্নিভ্যালের একটি লোক বলে। গঙ্গারাম কিছু বলে না শুধু হাসে। বলবার তার আছেই বা কি? সাহা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। নাহ'লে আজ মরতে হ'ত। কিন্তু তবুও সকলের সামনে এই ঈষৎ খোঁচায় তার কিরকম খারাপ লাগল। খারাপ লাগলে চলবে না। সকলের উপভোগের বস্তু সে। তার নিজের উপভোগ্য না হলেও বলবার কিই বা আছে।

ওদিকে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান একটি মেয়ে এসেছে আরেকটি ছোকরার সঙ্গে। মেয়েটির ব্লাউজ ছোট, গলা থেকে কাটা। ঈষৎ স্ফীত ঊর্ধ্বমুখী বুক বেরিয়ে পড়েছে। গঙ্গারাম তাকিয়ে দেখল হাসির দমকে সঙ্গের যুবকটির কনুয়ের সঙ্গে অবিরাম স্পর্শ লাগছে। অবিমিশ্রিত লালসায় গঙ্গারামের চোখ দুটি চক্‌চক্ করতে লাগল। মেয়েটির দিকে তাকাতে শুনলে: "How funny"—তার পর ছেলেটির গায়ে গড়িয়ে পড়ল হাসতে হাসতে। গঙ্গারাম শুধুই funny! মুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে নিলে গঙ্গারাম। আর তাকাবার প্রয়োজন নেই।

কে একজন মন্তব্য করল: "মোটা ক্ষেপেছে।" অন্যদিকে একটি লাবণ্যময়ী বর্ষীয়সী বধূ এসেছে দামী জড়োয়া গয়নায় আপাদ-মস্তক ঢেকে। সঙ্গে একটি ছেলে। বয়স সম্ভবত এগারো কি বারো। ছেলেটির দিকে চোখ পড়তেই সমস্ত জীবনের বিপুল ব্যর্থতায় করুণ ইতিহাস গঙ্গারামের স্মৃতিতে ভিড় করে এল! তার 'কমল-মণি' একমাত্র ছেলে গঙ্গারামের আজ নিশ্চয়ই এত বড় হয়েছে! হয়ত এমনি আশ্চর্য লাবণ্য ভরে আছে তার কিশোর ঘন কালো দুটি চোখ। আরো ভাবত গঙ্গারাম। ছেলেটি কি যেন বলছে। গঙ্গারাম শুনল পদ্য আওড়াচ্ছে সে।

'এই মোটা গঙ্গা'—হয়তো আরো কিছু বলত কিন্তু বর্ষীয়সী হঠাৎ বললেন: "ছি, অমন করে বলতে নেই খোকা" চোখে সেই করুণ

ছায়া! স্থূলোদর, কুৎসিত, শ্রীহীন গঙ্গারামের গাল দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বার আগেই মুছে ফেলল দুই হাতে। হাসাবার কথা যার লোককে তার চোখের জল দেখলে কেউ ক্ষমা করবে না। থেকে থেকে গঙ্গারামের চোখ দুটি শুধু চিক্‌চিক্ করতে লাগল।

হরদয়াল সাহার মাথায় সহসা আকাশ ভেঙে পড়ল। গঙ্গারাম ক্ষেপেছে। গঙ্গারাম চলে যাবে। প্রথমে হরদয়াল যা বুঝেছেন তা ঠিক নয়, মাইনে দ্বিগুণ ও আরো উত্তম আহারের প্রলোভন শুধু ব্যর্থ হয়নি, তাতে গঙ্গারাম প্রায় মারতে উঠেছে। তারপর অনুনয় বিনয় ও সকাতর প্রার্থনায় যখন কাজ হয়নি তখন হরদয়াল রেগে বলেছেঃ "জেল থেকে বেরিয়ে পথে পথে মরছিলে তখন এনে জায়গা দিয়েছি; আজ তুমি আমায় অপমান না করে কৃতজ্ঞতা জানাবে কি করে? যাও, তোমার মত জরদগবকে কে বসে খাওয়ায়—আমি শুধু তাই দেখবার জন্যই বেঁচে থাকব; গাল দিয়েই হরদয়াল বললেন ভুল হয়েছে! ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেরী না করেই গঙ্গারামের দু'হাত ধরে বললেনঃ "না খেতে পেয়ে মরে যাবো গঙ্গা। বুড়ো বয়সে না খেতে পেয়ে মরব।" অবশেষে গঙ্গার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হল। একমাস পর গঙ্গা আবার ফিরে আসবে—হরদয়াল সাহার কাছেই।

ক্ষুণ্ণ মনে ফিরতে ফিরতে হরদয়াল মনে মনে বললেন গঙ্গাটা একেবারে পাগল। ষাট বছরের দীর্ঘতিক্ত ব্যবসাগত অভিজ্ঞতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে যে লোক বসে বসে রোজগার ত্যাগ করে স্ত্রী পুত্রকে দেখবার তুচ্ছ বাসনায় চাকরি ছাড়বার কল্পনা করতে পারে হরদয়ালের হিসাবে সে পাগল না হয়েই যায় না। অথবা অন্য কেউ ফুসলিয়েছে। কিম্বা হয়ত নিজেই মেলা খুলবে। হ্যাঁ নিজের ঘরে এসে হঠাৎ এতক্ষণে আলো দেখতে পেলেন তিনি! গঙ্গারাম যে ফিরে আসবে তা তিনি বিশ্বাস করেননি। এতক্ষণে গঙ্গার মতলব বুঝতে পেরে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরেকবার ঝলসে উঠল।

তাঁবুর বাইরে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে আজ প্রথম গঙ্গারামের চোখে ঘুম এল না। শুধু মনে পড়ে বর্ষীয়সী বধূটির সঙ্গে সেই যে ছোট ছেলেটি এসেছিল তারই ছবি। আর সেই মৃদু ভৎর্সনা ; ছিঃ অমন করে বলতে নেই।

মনে পড়ে গেল দশ বছর আগের ইতিহাস। সুরমার মত সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় গ্রামের লোকের ঠাট্টা : "বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা" কিন্তু তখনও গঙ্গারাম 'সুবিমল' ছিল। ছেলেটি হবার পর গঙ্গারাম বাড়তে আরম্ভ করল। জমিদার বাড়ির ইস্কুলে তখন সে মাস্টার। ছেলেরা আড়ালে ক্ষেপাতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই। কিন্তু প্রথম প্রথম গঙ্গারামের কিছুই মনে হয়নি। তার পর হঠাৎ একদিন সুরমাও ঠাট্টা করে বসল! গঙ্গরামকে দেখে তখন না হেসে উপায় নেই। তবুও নিজের স্ত্রী তাকে দেখে কোনদিন হাসবে—এ তার কল্পনায় ছিল না। সুরমার সঙ্গে তার বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে এল।

পথে বেরোলে ছেলেরা হাততালি দেয়। ইস্কুল ছাড়তে হল গঙ্গারামকে। ঘরে বসে কাটালো ছ'বছর। এবং তার পর হঠাৎ একদিন সকালে সকলে জানতে পারল গঙ্গারাম উধাও হয়েছে। তখন গঙ্গারামের ছেলের বয়স ছ'বছর।

আজ হঠাৎ নিশীথ রাত্রির তারার দিকে চেয়ে তার মনে হল তার ছেলে হয়তো তা'ক উপহাস করবে না। একমাত্র সেই আশা নিয়েই দীর্ঘ ছ'বছর বাদে গ্রামে ফিরছে সে কাল। খোকা যদি তাকে আগলে রাখে তার সমস্ত গাঁয়ের উপহাস—এমন কি খোকার মায়েরও, গঙ্গারামের গায়ে তা লাগবে না। খোকা যে দেখতে সুন্দর হয়েছে এটা সে কল্পনা করতে পারে। একটি সুঠাম শ্যামল কিশোর—কল্পনা করতেই গঙ্গারাম আর ভাবতে পারে না! তার সমস্ত স্থূলত্বের আবরণের অন্তরালে তার খোকার স্পর্শ যেন পেতে থাকে

ট্রেনে উঠবার পর প্রথম গঙ্গারামের সময়ের কথা মনে পড়ল। ট্রেন ছাড়তে পনেরো মিনিট বাকী আছে। ভিড় আছে, একটি সিটে চারজন অল্পবয়সী ছেলে একটুখানি জায়গা করে বলল: "বসবেন নাকি?"—গাড়িশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। সকলকে অবাক করে দিয়ে গঙ্গারাম তারি মধ্যে বসবার চেষ্টা করল। দুটি ছেলে হাসতে হাসতে অন্য বেঞ্চে উঠে যায়। আজ এদের উপহাসে বিরক্তি এল না গঙ্গারামের। আজ সে অন্য লোক। ট্রেন চলতে আরম্ভ করার পর থেকেই অস্থির হয়ে পড়ল গঙ্গারাম। কল্যাণপুর কতদূর?—যদি খোকা বাবাকে না চিনতে পারে? পারবেই না ত—তার পর যখন মা এসে প্রণাম করাবার পর বলবেঃ "তোর বাবা, প্রণাম কর খোকা।" তখন গঙ্গারামকে দেখে সে কি ঘেন্না করতে পারবে? উপহাস করবে কি আর সকলের মত?

খোকাকে বড় করে তুলবে গঙ্গারাম। খোকা তার গাঁয়ের সকলকে ছাড়িয়ে যাবে। তার খোকার মত আরেকজনও হবে না।

কল্যাণপুরে নামতে রাত্রি হয়ে গেল। পথঘাট অল্প অল্প মনে পড়ছে। বাড়িটা স্টেশনের নিকটেই—শুধু এইটুকুই মনে ছিল গঙ্গারামের, কল্যাণপুরের মাটিতে পা দিতেই গুণগুণ করে সুর ভাঁজতে আরম্ভ করল সে। বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কি ভাবলো গঙ্গারাম। দরজা ধরে ঠেলতেই বামাকণ্ঠে কে বললো, যা তো খোকা,—দেখে আয় কে? বুক ফেটে বুঝি হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে বেরুতে চায় গঙ্গার। একটি অনন্ত মুহূর্ত;—অতিক্রান্ত হয়েও অতিক্রান্ত হতে চায় না!

লণ্ঠনহাতে দরজা খুলে দাঁড়ালো খোকা। গঙ্গা প্রায় চীৎকার করে উঠছিলোঃ এ কি! তার খোকার শরীরেরও সেই অপ্রতিরোধ্য অপ্রাকৃতিক বাড় সুরু হয়েছে। সেই আশ্চর্য, অসম্ভব বাড়। গলা মুখ বুক সব ভরে আসছে। আর ভাবতে পারলো না

গঙ্গা। তার কঠিন হাত হঠাৎ খোকার কণ্ঠনালী চেপে ধরলো। স্তিমিত লণ্ঠনের আলোয় গঙ্গা যে হাসছে তা দেখবার মতো আর কেউ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না।

ডাক্তার এই পর্যন্ত বলে জিজ্ঞেস করেন : নিজের হাতে ছেলেকে খুন করলে তার ফাঁসি ছাড়া আর কি হতে পারে? নিজের হাতে নিজের ছেলেকে হত্যার আর কি শাস্তি হতে পারে? বুঝলাম ডাক্তারের মনের কথা এ নয়। কেবল আমাকে ঝালিয়ে নিতে চান; ঝাঁকিয়ে নিতে চান আরেকবার। সেই বুঝে প্রত্যুত্তর করলাম : 'ফাঁসি তো নয়ই, কোনও শাস্তিই তাকে দেওয়া উচিত নয়।' 'কেন'—সকৌতুক প্রশ্ন পাগলের ডাক্তারের। 'কারণ, একজন লোক কেন তার একমাত্র ছেলেকে গলা টিপে মারে, তার জীবনের সেই নেপথ্য কারণের রহস্যের অতল থেকে ট্রাজেডির উৎসকে উন্মোচিত করার চেষ্টা শাস্তি দেবার অপচেষ্টার চেয়ে, অনেক, অনেক বেশি হিউমেন বলে!'

ডাক্তার জড়িয়ে ধরলেন আমার হাত দুটো। বুঝলাম যে সুরটি শুনতে চান, ঠিক সেই সুরটিই লাগাতে পেরেছি কথার বীণায়। হাত জড়িয়ে ধরে বললেন : গঙ্গারামেরও ফাঁসির হুকুমই হয়; কিন্তু ফাঁসি দেবার প্রয়োজন হয় না আর, কারণ ফাঁসি দেবার আগেই পাগল হয়ে যায় সে!

বারো

॥ এক ॥

"কথামালার ব্যাং জল থেকে মুখ তুলে বলেছিলো সেই ঢিল ছোঁড়ায় উন্মত্ত ছেলেদের: 'তোমাদের পক্ষে ঢিল ছোঁড়া হচ্ছে খেলা; আমাদের পক্ষে ঢিল খাওয়া মানে খেলা খতম্‌। সেকথা ভেবে দেখেছ কি?" কথামালার ব্যাং তবু মরবার আগে বলতে পেরেছিলো, কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে যাদের আমরা মানুষ বলে মনেই না করে ওই ব্যাংদের সমগোত্র মনে করে আমল দিই না কখনও যারা কিন্তু অতটুকু প্রতিবাদ করতেও অক্ষম। কথামালার ব্যাং মরে বেঁচে গিয়েছিলো; আর মানুষের কাছে ক্রমাগত আঘাত পেয়ে পেয়ে যতটুকু জীবিত তার চেয়ে অনেক বেশি মৃত এই সব হতভাগ্যদের না বলা কথাই আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে আগে সবচেয়ে জোরের সঙ্গে, হৃদয়ের সব উত্তাপ উজাড় করে প্রাণপণ বলবার একমাত্র কথা!"

—ডাক্তার দমের অভাবে একটানা এতগুলো বলবার পর অকালে যতি দিতে বাধ্য হলেন। নাহলে বোধ হয় তাঁর বক্তব্য বক্তৃতার আকার ধারণ করত। ডাক্তারের বয়স হয়েছে যে ডাক্তার তা মনে রাখতে চান না বলেই হজমের অতিরিক্ত গলাধঃকরণ করলে অপারগের যে অবস্থা হয়, ডাক্তারের দুরবস্থা যে কম হয় না কখনও কখনও,—এর প্রমাণ ইদানিং প্রায়ই পাই, কিন্তু তা নিয়ে কখনও বলি না একটি কথাও। ডাক্তারের সবচেয়ে নরম জায়গা সামান্য ছুঁতেও আমার প্রবল অনীহা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেদম হতে থাকে যত লোক ততই বেদম বকবার প্রেরণার যে দুর্বলতা তার থেকে রুগীর মতো ডাক্তাররাও যে মুক্ত নন, এ তথ্য অবগত হয়েই আপাতত যথেষ্ট কৃতার্থ বোধ করি আমি।

ডাক্তার যে ঘরে বসে আমাকে এই বক্তব্য শোনাচ্ছিলেন সে ঘর তাঁর চেম্বার নয়। সেটি বালিগঞ্জে এক আধা-ধনকুবেরের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে পূর্ণপ্রসাধিত বাইরের হলঘর। ঘর নয়, আজকের দিনে বাইশজনে মিলে যেখানে বসে যেটুকু জায়গার মধ্যে জানোয়ারের অধম হয়ে বাস্তুঘুঘুদের কৃপায় উদ্বাস্তুদের বাস নয় উপবাস, তার তুলনায় প্রাসাদ বললে অত্যুক্তি হয় না কিছুতেই।

ঘরখানা লম্বায় বড়ো। সমস্ত দেয়াল জুড়ে ফ্রেস্কো। মাঝখানে মখমলের ঘরজোড়া আসন। রূপোর ট্রেতে দামি সিগারেটের ট্রে খোলা। পাশেই আইসক্রীম পাত্রে আইসক্রিমের পাহাড়। এক কোণে, রবীন্দ্রনাথের ওরিজিনল পেয়ন্টিং; আরেক কোণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মাজীর সাক্ষাতের প্লাস্টার অভ প্যারির প্রতিকৃতি। তৃতীয় কোণে তানপুরা দাঁড়িয়ে আছে; এবং চতুর্থ কোণ বিধবার পরিধেয়ের মতো সাদা; তার সিঁথির মতো শূন্য। ওয়্যারিং-এর চিহ্ন আজ ফুলের প্রচ্ছদের তলায় চাপা পড়েছে। তিনখানা এই মুহূর্তে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাখা ঘুরছে পুরো দমে। আলো জ্বলছে পূর্ণচন্দ্রের চেয়ে উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে। গোলাপজলের, ধুনোর, ফুলের সিগারেটের ককটেলড্ বাসে আজ এই গন্ধমাতাল ঘরে আমরা দুজন মাত্র তখনও বসে আছি। বাইরে থেকে ভেসে আসছে বিহ্বল সানাইয়ের করুণ বিপ্রলম্ভ।

ডাক্তারই বলছিলেন আবার যে, 'হাসির ছলে কত লোককে যে আমরা অজান্তে এমন জায়গায় আহত করি যেখানে আঘাত করলে রক্ত বেরোয় না বটে, কিন্তু মানুষেয় সবচেয়ে বড় 'ঘা' হয়ত সেখানেই!'

একটি ঘোমটা দেওয়া সিঁদুর-টিপ পরা বেনারসী শাড়িতে চমৎকার সুন্দর, বয়স হয়েও যেন বয়স হয়নি মহিলা দরজার বাইরে বারবার যাওয়া-আসা করছিলেন। ডাক্তার আচমকা আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'ওই মেয়েটিকে ভালো করে লক্ষ্য করেছ?'

আমি বললাম: 'লক্ষ্য করবার মতো সুন্দরীই সুনিশ্চিত, এবাড়িরই বউ হবে নির্ঘাৎ।' 'না',—ডাক্তার হাসেন: 'বউ নয়; মেয়ে। ওর বিয়েই হয়নি এখনও।' পাগল নাকি ডাক্তার?—আবার তাকিয়ে দেখলাম মহিলাকে। সিঁদুর টিপ, হাতে শাঁখা এবং নোয়া, এবং মাথায় ঘোমটা; বিবাহের সমস্ত ট্রেডমার্কই তো সর্বাঙ্গে জ্বলজ্বল করছে। বিয়ের পর অনেক আধুনিকা অত্যন্ত ইদানীং এর অনিবার্যতা অস্বীকার করলেও, বিবাহ না করে এই চিহ্নগুলি অঙ্গে ধারণ করার দুঃসাহস স্ট্রিমলাইণ্ড বডি মডার্ণ মেয়ের যুগেও একটু বেশি না?

'বিশ্বাস করো' গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে কনভিনসিং কণ্ঠে ডাক্তার বলেন: বিশ্বাস করো, মহিলার বয়স হয়েছে কিন্তু বিবাহ হয়নি আজও। ওর ওই সিঁথেয় সিঁদুর, হাতে নোয়া আর শাঁখা, মাথায় ঘোমটা দেওয়াই ওই মহিলার একমাত্র পাগলামী। মেয়েটির ধারণা যে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। এবং ওর এই অদ্ভুত ধারণার কথা এখন পরিচিত, অর্ধপরিচিত, অপরিচিত প্রায় সবাই জেনে গেছে। তাই কেউ আর যথার্থ অবাক হয় না এখন কুমারীর সধবা পরিচ্ছদ পরিধানে।

তবুও বাধা দিই আমি: 'যদি সত্যই ওর বিয়ে না হয়ে থাকে আজও,—এখনও, এখনই বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় ওর। কারণ অত্যন্ত খুঁতখুঁতে চোখেও উনি এখনও নিখুঁত না হলেও আর, রীতিমতো রূপসী বলে গ্রাহ্য হবেন যে, সন্দেহ করা যার পেশার সবচেয়ে বড়ো উপাদান, সেই উকিল এবং ডাক্তারও নিশ্চয়ই স্বীকার করতে, একটু নাম হলেই মক্কেলের নথী অথবা রুগীর অবস্থা পরীক্ষা করতে যেটুকু সময় নেন, তার চেয়েও কম নেবেন যে এতে সন্দেহ কী?

ডাক্তার আবার হাসেন: 'ওই যে বললাম, ওর ধারণা, বিয়ে হয়ে গেছে ওর। এবং হিন্দু সধবারও যে আবার বিয়ে হয়, হতে পারে আবার, এ আইন চালু হবার আগেই ওর মাথা খারাপ হয়ে

গেছে। পাগল হয়েও, ও যে বিবাহিত একথা ওর মন থেকে যায়নি ; বরং এটাই ওর একমাত্র পাগলামী হওয়ায়,—তাই ; নাহলে ওকে বিয়ে করবার জন্যে যেকেউ দেবে সানন্দ সম্মতি। এখনও যাকে দেখে তুমি নির্দ্বিধায় সুন্দরী স্বীকার করছ দশ বছর আগে দেখলেও তার দিক থেকে তুমি চোখ ফেরাতে পারতে না। কিন্তু আজ ওর কেন যে ওই মানসিক বিকার তা আর কারুর আলোচনার বিষয় নয়। সবাই শুধু ও পাগল জেনেই দূরে সরে যায়। নাহলে খুব কাছে যদি কেউ আসতে পারতো ওর, সে শুনতে পেত ওর হৃদয়জোড়া হাহাকার ; সে জানতে পারত কে করেছে ওকে পাগল।'

॥ দুই ॥

ওই মহিলার নাম যে সুমিত্রা মিত্র সেকথাও আজ সবাই বিস্মৃত। কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ছাত্রছাত্রী তাদের এই নাম শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আজও বিদ্যুতের মতো চমকে যাবে রক্তের অক্ষরে লেখা দুটি বছর। ১৯৪০-৪১-এর সেসান। লক্ষ্ণৌ-এর মেয়ে সুমিত্রা মিত্র সেদিন য়ুনিভার্সিটির সারা বালকদের নিশীথ রাত্রির নিদ্রাপহারক; মিড্‌সামার দিনের ড্রিম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের চেয়ে বেশি হয়নি। কিন্তু সেদিন যেমন, আজও তেমনই সুমিত্রার মতো অগ্নিশিখা আর একবার জ্বলে ওঠেনি। সিনেটহাউস-নিশ্চিহ্ন, গোলদীঘির উল্টোদিকে, ঐতিহ্যমণ্ডিত ওই বাড়িটিতে,—যে বাড়ির ভেতরে পড়াশুনো এবং বাইরে বেচাকেনা চলে একই সঙ্গে।

সুমিত্রা লক্ষ্ণৌ-এর মেয়ে হয়েও কলকাতা থেকেই বরাবর পড়াশুনো করেছে। ম্যাট্রিকুলেশান, আই-এ ও বি-এ-তে দ্বিতীয় হয়েছে বরাবর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে; ইংরেজিতে কিন্তু প্রথম হয়েছে আগাগোড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগড়ায় এসে তার প্রথম দেখা হলো সেই অদ্বিতীয় ছাত্র, ত্রিপুরারী কাঞ্জিলালের সঙ্গে—তিন পরীক্ষাতেই সে সব বিষয় মিলিয়ে হারিয়েছে সুমিত্রাকে; কেবল কোনও বারই জিততে পারেনি ইংরেজি পরীক্ষার বেলায়। এবং ত্রিপুরারী যে অন্য কোনও বিষয় না নিয়ে ইংরেজিতেই এম-এ পড়তে এলো শেষ পর্যন্ত, সুমিত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে তার কারণ চ্যালেঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয়। সুমিত্রা দাঁতে দাঁত দিয়ে স্বগতোক্তি করলে, ঠিক আছে; দেখা যাবে এবার। ত্রিপুরারী কিন্তু কিছুই বললো না। উচ্চারণ করে অথবা মনে মনে,—কোনও ভাবেই না। ইংরেজি পড়তে আসার আসল কারণ তার সম্পূর্ণ অন্য। তার বাবা সুমোহন

কাঞ্জিলাল এবং ঠাকুর্দা বিদ্যাপতি কাঞ্জিলাল, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষাতে কোনও সময়েই দ্বিতীয় হওয়া দূরে থাক,—কোনও বিষয়েই কখনও দ্বিতীয় হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। ইংরেজিতে বরাবর দ্বিতীয় হওরায় ত্রিপুরারীরই সেই জায়গায় লেগেছিলো যে জায়গায় লাগলে চীৎকার করে কাঁদা যায় না অথচ ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে ভেতরে ভেতরে। আর যে কেউ ইংরাজি ছাড়া যে কোনও বিষয়ের নৌকায় উঠলে যখন পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানের নিরাপদ জমিতে উত্তীর্ণ হতে পারে অনায়াসে এই কারণে ইংরেজিক্লাসের ধার কাছ মাড়াতো না, ত্রিপুরারী—যার শিরায় বইছে সুমোহনের এবং পিতার মার্ফৎ বিদ্যাপতি কাঞ্জিলালের শোণিত তার পক্ষে বন্দরের নিরাপত্তার চেয়ে অসীম সমুদ্রের আহ্বান যে অনেক বেশি উদ্দীপনা এবং উত্তেজনার সেকথাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে কাউকে।

রূপ আর রূপো, যে দুই প্রয়োজন দুনিয়ায় সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে প্রধান, সুমিত্রা তার প্রথমটা অংগে এবং দ্বিতীয়টি সংগে করে এনেছিলো পর্যাপ্ত পরিমাণে। এক অঙ্গে এতো রূপ আর কখনও আর কোথাও দেখা যায়নি, এমন কথা বলব না;—তবে এক অঙ্গে এত রূপ এবং একসঙ্গে এত রূপো, বোধ হয় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তরহিত না হলেও সচরাচরের বিপুল ব্যতিক্রম। সাড়ে পাঁচ ফিটের ওপর দৈর্ঘ্যে; ললিত কুঞ্চিত কেশ। নিটোল দুটি হাত। পায়ের গোছ চেয়ে দেখবার মতো। কটিদেশ মুঠোয় ধরা যায়; নিতম্ব বল্মীকসদৃশ। গায়ের রঙ রোদ্দুর-রাঙা ভোরের চাঁপা। কৃষ্ণপক্ষ রাতের কালো দুটি দীঘল চোখে রাতের ময়ূর তার পাখা মেলে দিয়েছে। হাসলে দু-গালের মাঝখানে টোল খায়; জর্দার দুটিমাত্র দানা ধরে এমন ছোট দুটি টোল সমস্ত মুখখানাকে এক অতিরিক্ত আশ্চর্য ব্যঞ্জনা দিয়েছে। শব্দ করে যখন হাসে তখম মনে হয় যেন বহুদিন একঘেয়ে টিপ টিপ করে বৃষ্টিপড়া পচা বাদল কেটে গিয়ে সেইমাত্র এক মেঘ মুক্ত

রঙীন সকাল হলো। বাঙলা বলে ঈষৎ অবাঙালী উচ্চারণে; ঘণ্টার শব্দের মতো গোল গোল ধ্বনি দারুণ উত্তেজক। প্রায় নিরাভরণ অঙ্গে গলায় রক্তের মতো লাল, রজনীগন্ধাব মতো সাদায় মেশানো পাথরের মালা রক্তিমাভা বিচ্ছুরিত বুকের ওপর দোলে নিঃশ্বাসের দোলায়। ঠোঁটের বাঁদিকে একটু ওপরে কালো তিল চোখ টানে। এক হাতে ছোট্ট সরু ফিতের মতো স্ট্রাপে বাঁধা সোনার ঘড়ি। আরেক হাতের আঙুলে তাকিয়ে আছে বেড়ালের চোখ।

সুমিত্রার বাবা নীলধ্বজ মিত্র কীর্তিমানতম প্রবাসী বাঙালীদের অন্যতম নয় মাত্র; অগ্রণী। লখনৌ-এ সুরু করেন কারবার; এখন সারা ভারতবর্ষে তাঁর নাম এবং ব্যবসা দুই ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সেই সময়ে বোম্বাই সহরে বেশি সময় বছরের কাটাবার জন্যে বাঙালীর এমন কোনও অনুষ্ঠান অসম্ভব ছিলো যা তাঁর আনুকূল্য প্রার্থনা না করে করা যেত।

এম-এ পড়বার সময় সুমিত্রাকে তার বাবা নীলধ্বজ মিত্র রেখে যেতে বাধ্য হন নীলধ্বজের বন্ধু করুণাশঙ্কর মিত্রর কাছে। করুণাশঙ্কর এবং নীলধ্বজ দুজনেই প্রায় উলঙ্গ শিশু-অবস্থা থেকে বন্ধু। এবং তাদের দুজনের মধ্যে যৌবনকালে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি একজনের নেপথ্যে যা আরেকজন তার পরের মুহূর্তেই না জেনেছে। মেয়েছেলে, এবং টাকা যে দুই বস্তু নিয়ে সাধারণতঃ বন্ধুত্বে চিড় ধরে সে-ই অগ্নিপরীক্ষাতেও এরা দুজনেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যৌবনের সেই নানা রঙের দিনগুলোতে। তারপর নীলধ্বজ লখনৌতে ধনকুবের শেঠ অর্জুনকিশোর কার্নানির চোখে পড়ে যান। এবং আস্তে আস্তে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন সর্বভারতীয় খ্যাতির প্রায় শিখরদেশে। অন্যপক্ষে করুণাশঙ্করকে কারুর চোখ পড়তে হয় না; ববং তাঁর সন্ধানী চোখ পড়ে যায় ব্যবসার একটি খোলা মাঠের দিকে যেখানে ভারতীয় কোনও ব্যবসাদারের পা বাড়াবার দুঃসাহসই হয়নি তখনও। জাহাজে করে মাল নিয়ে যাওয়া নিয়ে

আসার যে কারবার সাহেবদের একচেটিয়া ছিলো এতকাল, সেই অজানা রাজ্যের অভিযানে দুরন্ত জন্মবেপরোয়া করুণাশঙ্কর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কারুর নিষেধ নিলেন না মেনে। নীলধ্বজেরও না। তারপরে অবশ্য অনেক যুগ কেটে গেছে।

করুণাশঙ্কর লোকসানের পর লোকসান করলেন। যক্ষের ঈর্ষাযোগ্য পৈতৃক সম্পত্তি ফুটো কলসীর জলের মতো যখন জাহাজের খোল বেয়ে জলে প্রায় মিলিয়ে এসেছে তখন সুপ্রসন্ন হলেন স্বয়ং লক্ষ্মী। যুদ্ধ বাধলো। এবং এই ভারতীয় দুঃসাহসীকে আর বঞ্চিত করতে পারলে না সাহেবেরা। বরং তার সাহায্যের জন্যে ব্যগ্র কর বাড়াতে হল সাদা চামড়াকেই। সুদ সুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ করুণাশঙ্কর উসুল করলেন লোকসান, সাহেব বাচ্চাদের প্রয়োজনের কাঁধে ভর দিয়ে। চাকা যখন ঘুরেছে তখন তাকে পুরোদমে ঘুরিয়ে যাও। মেক হে হোয়াইল দ্য সান শাইনস্—করুণাশঙ্করের জীবনের মটো হলো এই জীবন্ত প্রভাব। তার কয়েকদিন আগেই জন্ম নিয়েছে করুণাশঙ্করের একমাত্র সন্তান; একটি মেয়ে। করুণা এই ভাগ্যবতীর নাম রাখলেন নীলা। একটি নীলার আংটি তাঁর কন্যার জন্মের আগের দিন পরেছিলেন তিনি। কন্যার জন্মের আটচল্লিশ ঘণ্টা কাটবার আগেই সাত লাখ টাকার সরকারি কণ্ট্রাক্‌ট এসে গেলো করুণাশঙ্করের প্রায় ফেলে আসা শূন্য পকেটের হতাশা গহ্বরে।

আজ জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে নিশীথের গহনে হারাবার মুহূর্ত যখন দুই বন্ধুর—নীলধ্বজ আর করুণাশঙ্করের ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় নীলধ্বজ তার মেয়ে সুমিত্রাকে এম-এ পাস না করা পর্যন্ত রাখতে এলো করুণার কাছে। এর আগের পরীক্ষাগুলো হস্টেলে থেকে দিয়েছে; কিন্তু কোনও বারই কাঞ্জিলালকে পরীক্ষায় হারাতে না পারার কারণ হয়েছে হস্টেলে বাস। নীলধ্বজ হয়ত সুমিত্রার জন্যে কলকাতায় বাড়ি ভাড়াই নিতেন গোটা কিন্তু সেই সময়ে ভারতবর্ষের বাইরে যাবার ডাক এলো হঠাৎ· ব্যবসায়ের জরুরী

ডাক। নীলধ্বজ এবং করুণাশঙ্কর দুজনেরই তার অনেক আগেই অর্থের প্রয়োজন ফুরিয়েছিলো। ব্যবসা এখন পেটের দায়ে নয়; নেশার দায়ে; প্রাণের দায়ে। তাই বিদেশে ব্যবসায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন কই করুণাশঙ্কর।

যাবার আগে সুমিত্রাকে রেখে গেলেন করুণাশঙ্করের কাছে। বললেন তোমার বাবার চেয়েও যিনি তোমার অনেক বেশি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আজ তার হাতে তোমাকে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে যেতে পারছি। একে তোমার বাবার মতোই তুমি শ্রদ্ধা করতে পার, ভালোবাসতে পারো যাতে সেই আশীর্বাদ করি।

করুণাশঙ্করের মেয়ে নীলা, পরিচিত মহলের নাম নীলি, সেও তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী; ওই ইংরেজি সাহিত্যেরই।

॥ তিন ॥

করুণাশঙ্করের একমাত্র মেয়ের রূপ ছিলো না; কিন্তু রূপো ছিলো যথেষ্ট, অপব্যয়ের পক্ষেও অতিরিক্ত। তারই পাখায় ভর করে সে উড়ে বেড়াতো সমাজের শাখায় শাখায় রঙীন প্রজাপতির মতো। রূপের অভাব রূপোর প্রভাবে বিস্মৃতপ্রায় ড্রয়িংরুম কলকাতার উপর মহলের প্রায় সবাই মেনেই নিয়েছিলো নীলিকে তাদের মক্ষিরাণী বলে। নীলিকে না হলে বন্যার্তদের সাহায্যে ভারাইটি ফাংশন অচল; নীলি-বাদ গানের জলসা ভাবা যায় না। ব্যাডমিণ্টনে মিক্সড ডাবলসে নীলিকে পার্টনার না পেলে স্মার্ট সেটের জীবনই বৃথা। নীলি, নীলি, নীলি। লেখাপড়ায় ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তার সমান উৎসাহ। নীলির কাছে যারা আসে তারা সবাই নীলির কথায় ওঠে বসে। নীলি তাদের মধ্যে কাকে চায় আরে কে না চায় বলা শক্ত। কারণ নীলি যত না নাচে তার চেয়ে বেশি নাচায় তার অনুরাগী মহলকে। তার থেকে কার প্রতি ওর জেনুইন আসক্তি আর কার প্রতি ওর নিরাসক্তি বলা সহজ নয়। তবে অনুরাগী মহলের দুপক্ষেই যে নীলির যে কোনও অনুরোধ, অনুরোধও নয়, প্লিজ-এর প্লিতেই, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারই জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় একথা বলা বাহুল্য; বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক যে নেহেরুর চেয়েও বর্তমানে জনপ্রিয় কংগ্রেসী সেকথা বলা যেমন, তেমনই অথবা তার চেয়েও অবাঞ্ছিত বাহুল্য মাত্র।

এই অন্তরঙ্গ মহলে একটি অলিখিত নির্দেশ সবাই মেনে চলত। নীলির কোনও কথায় কেউ 'না' বলতো না কখনও। বৈশাখের দুর্দান্ত ছাতি ফেটে যাওয়া গরমে সে যদি কাউকে গান গাইতে বলতো তাহলে সে গায়ক জানতো প্রকৃতি যাই বলুক, নীলি তাকে গাইতে বলছে: বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে। এবং সমস্ত লোকের

টিটকিরি, সমস্ত স্ত্রীলোকের হাসিতে ফেটে পড়া সত্বেও, এ গান না গেয়ে উপায় নেই কারণ গায়ক অথবা গায়িকা যেই হোক সে Her Majesty's Governmet-এর লয়্যাল ভৃত্য। হার ম্যাজেষ্টিকে চটিয়ে সে জেতার দাম দিতে চায়। ডাঙায় বাস করে চায় না কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করতে। সে জানে, behave like a Roman while you are in Rome-এর প্রকৃত তাৎপর্য।

সেই সর্বজনস্বীকৃত সম্রাজ্ঞী নীলির অন্তরঙ্গ মহলে বিদ্রোহের পতাকা উড়তে দেখা গেল এই প্রথম। সে পতাকায় জ্বলজ্বল করে উঠলো যে নাম, সে নাম কোনও লোকের নয়। এক মেয়ের! তার নাম সুমিত্রা মিত্র।

নীলি এতকাল নিশ্চিন্ত ছিলো। নিশ্চিন্ত ছিলো যে তার দল তাকে ছাড়া আর কাউকে দেবে না মক্ষীরাণীর পদ। এখন সে বিশ্বাসের মাটি পায়ের তলা থেকে সরে যাবার উপক্রম করতেই সে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। তাকিয়ে প্রথম যাকে দেখতে পেলো, সে, সুমিত্রা মিত্র। সুমিত্রাকেই দায়ী করলো নীলি। সুমিত্রার কৈফিয়ৎ তলব করার অবশ্য সাহস হলো না নীলির। কারণ সুমিত্রা হিল্লিদিল্লি করা মেয়ে। বাঙলা কথার জবাব দেয় ইংরেজিতে, ইংরেজি কথার উত্তর করে বাঙলায়। নীলির ভাষ্যমতে এটাও সুমিত্রার একটা চাল। সুমিত্রাও বুঝলে যে তার আগমনে স্বর্গপুরীতে সবাই সুখী নয়। নীলির দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টাই অবশ্য নীলির চোখে সুমিত্রার একমাত্র অপরাধ নয়। সুমিত্রার অপরাধের সংখ্যা কয়েকদিনের মধ্যেই নীলির সব কটি আঙুলের আর কদিন পরে তার গোণার ক্ষমতারও সীমা অতিক্রম করে গেল সম্পূর্ণ।

প্রথমেই বলি, নীলির আধুনিক গানের আসর কাণা করে দিলো সুমিত্রা জয়জয়ন্তী গেয়ে একখানা। পরের আসরে নীলি যাকে প্রায় টেনে হেঁচড়ে ধরে বেঁধে আনলো খেয়াল শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে সুমিত্রা সুদ্ধ সবাইকে, সে এমন হাত-পা নেড়ে, মুখ ভেংচে দাঁত

খিঁচিয়ে এমন গানের ব্যাকরণের গুঁতো মারতে লাগল এতক্ষণ ধরে যে, নীলির সেদিনকার গানের আসর খালি হয়ে যেত কবে যদি না ঠিক সময়ে রবীন্দ্রনাথের গানের ঝর্ণাতলায় গিয়ে বসত সে; তারই আগের সন্ধ্যার জয়জয়ন্তীকার সুমিত্রা মিত্রই। ভাঙ্গে তবু মচকায় না নীলি। জিজ্ঞেস করে সুমিত্রাকে সকলের উপস্থিতিতেই, জিজ্ঞেস করবার দুঃসাহস করে! কেমন লাগলো আমাদের ক্ল্যাসিকাল গান? সুমিত্রা কৌতুক-বিচ্ছুরিত কালো চোখে হাসলে ঃ তোমাদের ওস্তাদের গান শুনে আমার পুরনো গল্প মনে পড়ল একটা! কৌতূহলের চিনির ডেলার গন্ধ পেতেই ছেঁকে ধরল মক্ষিকার দল, মক্ষিরাণীর নির্দেশ ছাড়াই ঃ কি, কি গল্প ভাই, বল না। সুমিত্রা বললো ঃ ক্ল্যাসিকাল গাইয়ে একজন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমাদের আজকের স্বনামধন্য এই ধ্রুপদী গায়কের মতোই, গেয়েও থামে না যখন কিছুতেই, তখন উঠে যায় প্রায় সবাই একে-একে। রাত বারোটা বাজে; তখন সারা ঘরে গাইয়ে ছাড়া আর একজন মাত্র বসে আছে। একটি মাত্র সেই গায়ক আর তার একমাত্র শ্রোতা; বাকী সবাই খরস্রোতার মতো বয়ে গেছে গৃহসিন্ধুর উদ্দেশে। পুলকিত গায়ক গান থামিয়ে এক সময়ে সেই একমাত্র শ্রোতার উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয় পরিপক্ক ফল লাভের আশায় প্রশ্নের তীর ঃ গান খুব ভাল লেগেছে বুঝি? এখনও বসে যে? প্রশ্নপাঠ নিরুত্তর করে সেই অপেক্ষমান ধৈর্য ঃ আজ্ঞে না; গানের জন্যে নয়; বসে আছি যার ওপর বসে আপনি গাইছেন সন্ধ্যে থেকে, সেই জাজিমটার জন্যে; ওটা আমার কি না!

সবাই কলহাস্যে ফেটে পড়ে; মক্ষিকারা সবাই। মুখ কালো করে বেরিয়ে যায় কেবল নীলি; তাদের মক্ষিরাণী। আরও একটা কারণ, সুমিত্রার ওপরে নীলির উষ্মার, নীলি নিজেই ডেকে আনলো! ব্যাডমিণ্টান কোটে সুমিত্রাকে ডাকলো না নীলি ইচ্ছে করেই; মনে ভয় ছিলো যদি খেলাতেও মুখে চুনকালি দেয় সুমিত্রা। দলের

লোকের কাছে সগর্বে ঘোষণা করেছিলো তাই নীলিঃ খেলাধুলোয় বোধ হয় তেমন চৌকষ নয় সুমিত্রা, নাহলে ডাকতাম নিশ্চয়ই। একটু বাদেই অবশ্য হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া ব্লাডারের মতো চুপসে গেল অত্যুৎসাহে অতিরিক্ত ফাপানো কথার বেলুন যখন খেলা বন্ধ করে সবাই তাকিয়ে রইল সুমিত্রার গাড়ি ক'র বেরিয়ে যাবার দিকে। সুমিত্রার হাতে ঝকঝক করছে সূর্যালোকে নতুন টেনিস র‍্যাকেট।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। বাড়ীর যে মহলে নীলির এবং নীলির দলের আর-আরদের প্রবেশ নিষেধ সেখানেও সুমিত্রার অবাধ যাতায়াত নয় কেবল, সাদর নিমন্ত্রণ আসে খোদ নীলির মায়ের কাছ থেকেই। নীলির মা তাঁর পুজোর ঘরে ঢুকতে দিতেন না কাউকে। নিজের হাতেই করেছেন এতকাল সব। সেখানে অনধিকার প্রবেশ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি ম্লেচ্ছ স্বভাবের একমাত্র সন্তান নীলিরও। কিন্তু সুমিত্রা সেখানেও যে কখন প্রবেশ করেছে, গায়ের জোরে নয়, আন্তরিকতার জাদুতে,—টের পেলেন না পুজোর ঘরের চৌকাঠ না পেরোয় কারুর পা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্বয়ং নীলির মা। নতুন কাপড় সেলাই করে সুমিত্রা পরালে রাধাকৃষ্ণকে নতুন বেশ। আলো জ্বেলে চারপাশে ফুলে ফুলে মালা গেঁথে, চন্দনে, ধূপে, শাঁখের মুখে ফুঁ দিয়ে পূজার ঘরকে দিল নতুন পরিবেশ। সুমিত্রা না সাজালে ডলির মায়ের রাধাকৃষ্ণকে এখন, পছন্দ হয় না তাঁর নিজের হাতের সাজানোও তেমন করে আর।

নীলির বাবা কারবার থেকে ফিরলে সেখানে যে নিজের হাতে জুতোর খুলে দেয় ফিতে সে, আজন্ম যাকে নীলি দেখে এসেছে সেই রঘু বেহারা নয়; সুমিত্রা স্বয়ং। নীলির বাবা সোচ্চার আপত্তি সরে গিয়ে আগ্রহ সম্মতির রূপ নিয়েছে কখন সুমিত্রার হাতে সব কাজ তুলে দেবার ব্যাপারে, নীলির বাবা তা জানতেও পারেন নি। চায়ের কাপ কখন দিতে হবে ভোরে আর মশলার প্লেট হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াতে হবে কখন ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে এসে দাঁড়ালে

পোর্টিকোর তলায় ; ঘড়ির কাঁটার চেয়েও কারেক্ট টাইম সুমিত্রার সব কাজের। জামাকাপড় ইস্ত্রি কেমন করে করে রাখতে হয় আর কোন্ সার্টের সঙ্গে কোন্ টাই চলে দুবছরে একবার ভারতবর্ষের বাইরে ঘুরে আসা নীলির বাবার পক্ষেও তা যেন বুড়ো বয়সের আরেক লেসন্। একটা সিগারেটের টিন হাতে থাকতে আরেকটা সিগারেটের টিনের জন্যে মনে করিয়ে দেয় করুণাশঙ্করকে। করুণাশঙ্কর ভুললে ধমক দেয় বিস্মৃতির জন্যে কণ্ঠস্বরে অভিমানের অমৃতরস পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢেলে, তবেই। করুণাশঙ্কর এখন একদিন সুমিত্রা বাইরে থাকলে অসহায় বোধ করেন। রঘু বেহারা থাকতেই চায় না আর ; বলেঃ মাইনে চুকিয়ে দিন ; বাড়ী যাই। মেয়েছেলে পুরুষমানুষ হারিয়ে দেয় কাজে যে বাড়ীতে সে বাড়ীতে সে যে ফালতু তা বোঝবার জন্যে লেখাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করে না রঘু। তার চুলে পাক ধরেছে বেশ কিছুকাল।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে যে কারণে নীলি আহত হয় ভেতরে ভেতরে অথচ প্রকাশ করবার পথ অথবা সৎসাহস পারে না সঞ্চয় করতে সে কারণ দূর করবার ক্ষমতা সুমিত্রারও নেই। লম্বা, ফর্সা মজবুৎ শরীর সুমিত্রার। সেজন্যে নয়, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুমিত্রা ভারি দলমলে মেয়ে। দলের সমস্ত মেয়ের মধ্যে সুমিত্রাকে মনে হয় দল ছাড়া। সেখানে এসে বসে মনে হয়, একমুঠো আলো ছড়িয়ে গেছে বুঝি ! দুপায়ে ভরা যৌবন ছড়াতে ছড়াতে সে যখন ঘুমের-ঘোর-না-কাটা আলস্যভরে চলে তখন মনে হয় তার অঙ্গে অঙ্গে কে বাঁশি বাজায় বুঝি।

কিছুতেই যখন সুমিত্রার সঙ্গে এঁটে ওঠা গেল না ; যুৎ করা গেল না কোনও দিকেই তখনই নীলিমার শরণ নিতে বাধ্য হল সে, নীলির মামাতো ভাই সিদ্ধার্থ সরকার ! সিদ্ধার্থকে সুমিত্রার নামে এক কাহন করে লাগাল নীলি। তারপর বললঃ সুমিত্রাকে যদি হার স্বীকার করাতে না পার তাহলে বুঝবো এতদিন যাদের নিয়ে

ছিনিমিনি খেলতে পারার ক্ষমতায় বদনাম তোমার এতো, তারা কেউই মেয়ে নয় ; সবাই,—মাটির পুতুল।

সিদ্ধার্থ তার ঘন কালো ঝাঁকড়া চুলের থোকা চোখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে কথা দেয় ঃ যাবো। নিশ্চিত হবার ভান করে নীলি ; তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না সে। নতুন মেয়ের নাম শুনলেই যে শিকারের শিখা জ্বলে ওঠে সিদ্ধার্থের চোখে সে আগুন যেন আজ আর কারুর চিন্তায় ছাই চাপা।

॥ চার ॥

সত্যিই তাই। অনেক মেয়ের সঙ্গে অনেক খেলায় ক্লান্ত সিদ্ধার্থ জীবনের দোরগোড়ায় সেই প্রথম কড়া নেড়ে জানান দিয়ে নিজে থেকে এসে দাঁড়িয়েছে রবিঠাকুরের মেয়েদের মুখের মতো গোল গোল ছাঁদের হরফে উচ্চারিত সেই যাকে বলে, রোদনভরা বসন্তের প্রথম রঙীন দিন। সেই প্রথম প্রেমের আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণের কথা বলবার আগে সিদ্ধার্থ সরকারের জীবনের বাইশটি ফেলে আসা বছরের নানা রঙের দিনগুলোর কথা বলে নিলে এই ত্রিকোণ গল্পের এইবার সুবিধে হবে। লেখকের পক্ষেও, পাঠকের পক্ষেও। এবং সে কাহিনী, যেদিনকার কথা বলা হচ্ছে এখন সেদিনকার মেয়ে মরুভূমির কলকাতা সমাজে ওয়েসিসের এতো উত্তেজক রোমাঞ্চের।

সিদ্ধার্থ সরকার তখন কলকাতা মেডিকেল কলেজের শেষ ইয়ারের ছাত্র। লম্বায় ছ'ফিটের ওপর ; বডির ফর্মেশান স্পোর্টার্স। কোঁকড়া চুল ; চোখ তাকালেই মনে হয় দুচোখে হাসছে। পাতলা ঠোঁট ; ছোট ছোট ফাঁকশূন্য নীরেট দন্তরাজি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। নীচু হলে কিছু কুড়োতে মনে হয় কোমরটা স্প্রিং-এর ; মুখখানা টানা চোখে, ভুরুর ধনুকে, ওভ্যালশেপে প্রায় গ্রীক ভাস্কর্য। হাসে হা হা করে ; কথা বলে উচ্চস্বরে। যে আসরেই বসে সে আসরের গেল প্রাইমাডোনা। কাটা কাটা কথায় উত্তর দেবার উপস্থিত বুদ্ধিতে দলের লোকেদের আনডিসপুটেড লিডার। সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বলবার কথা সিদ্ধার্থ সরকারের সম্পর্কে, তার ডেভিল মে কেয়া' এ্যাটিট্যুড। কোনও কোনও লোক যেমন গায়ের জোরে তত নয়, যত দুঃসাহসের জাদুতে জীবনের বাজি জেতে, আমাদের সেই সিদ্ধার্থ সরকার সেদিন ছিলো তারই লাস্ট ওয়ার্ড। সিদ্ধার্থ ছেলেবেলা থেকেই যে কোনও রকমের হিরোওয়াশিপ-ব্যাধি থেকে মুক্ত ; যাকে

বলে ইম্যুনড্। যারই নাম বলা যাক না কেন, সিদ্ধার্থর তার সম্পর্কে অশ্রদ্ধা না থাকলেও নাম শুনলেই পায়ে লুটিয়ে পড়া আদিখ্যেতা নেই।

একদিন রামানন্দ চাটুজ্যের সম্পর্কে আলোচনায় প্রবাসী-সম্পাদকের অন্ধ ভক্ত একজন ফস করে বলে বসেছিলোঃ এমন জার্নালিস্ট আর হবে না। বলা মাত্তর কথাগুলো প্রতিবাদের পেট্রলে দেশলায়ের কাঠি জ্বেলে দিলো যেন। দপ করে জ্বলে উঠলো সিদ্ধার্থঃ এতক্ষণ যা বলছিলে তা সেন্সবল্; এইমাত্র যা বললে তা সিলি। রামানন্দবাবু মস্তো বড়ো সাংবাদিক স্বীকার করি; তাঁর মতো কলম খবরকাগজ ওয়ার্ল্ডে আর একজনেরও নেই, ইথে আমার আপত্তি অল্প; কিন্তু তাঁর মতো সাংবাদিক ভবিষ্যতেও কেউ হতে পারবে না, দিস ইস সিম্প্লি টকিং থ্রু ওয়ানস্ হ্যাট। হবে না, কি করে বলছ? তুমি কি ভৃগু না চেরো?

আরেকদিন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ উক্তি করেছে একজনঃ রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লেখার আর কোনও মানে হয় না! যে বলেছিলো সে অবশ্য আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে দিতেই প্রভোক করেছিলো। এবং সিদ্ধার্থ তা বোঝেনি এমন নয়, তবুও। ক্ষ্যাপাবার জন্যে ইষ্টদেবতার নাম ধরলেই যেমন সেই নাম আবার শুনবার জন্যে উত্তেজিত না হলে পারে না ভক্ত, তেমনই প্রতিবাদের লাল জ্বলতেই ক্ষ্যাপা মোষের মতো না তেড়ে এসে পারলো না সিদ্ধার্থ! রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লেখার মানে হয় না বলে তোমরা ভাবো বুঝি রবীন্দ্রনাথের প্রতি খুব শ্রদ্ধা দেখানো হয়। আসলে,—দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীকে এর চেয়েও অসম্মান দেখানো আর কিছু বলেই অসম্ভব। বাঙলা সাহিত্যকে এক সিংহদ্বার থেকে আরেক সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন মধুসূদন, বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথে এসে যদি সে সাহিত্য-স্রোতস্বিনীর গতি আরও দুর্বার না হয়ে উঠে রুদ্ধ হয়, তাহলে রবীন্দ্রকীর্তির মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কারণও অক্ষুণ্ণ থাকে না।

সিদ্ধার্থ হচ্ছে কথায়, চলায়-বলায়, কাজে-কর্মে সে-ই যাকে মেয়েরা যত অপছন্দ করে তার চেয়ে অনেক বেশি করে পছন্দ ; কারণ সেই পুরানো প্রবাদ ঃ লেডিস লাভ ব্রুটস। সত্যিই মেয়েদের সম্পর্কে তার মতো হৃদয়হীন, তার মতো ব্রুট্যালি ক্যালাস বড় একটা পাওয়া শক্ত। তার একটি নারীসম্পর্কিত উক্তি মুনিদেরও চঞ্চল করে তুলত শুনতে পেলে। স্থানে অস্থানে উচ্চারিত তার সেই কুখ্যাত অবসারভেসান হচ্ছে, মেয়েরা আসলে ট্রামবাসেরই দোসর : একটাকে ছাড়তে না ছাড়তে আরেকটা এসে হাজির।

যে ট্রামটাকে ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ পরের ট্রামটার দিকে পা বাড়াত,—সেই ট্রাম অর্থাৎ তার লাস্ট জুলিয়েৎ যখন দেখত সিদ্ধার্থ হাত বাড়াচ্ছে তার লেটেস্ট লায়লার দিকে তখন ফণা তুলে দাঁড়াত সিদ্ধার্থের আগেকার ভিক্টিম। নিজে থেকে নেমে এসে গায়ে পড়ে সাবধান করে দিত সিদ্ধার্থের সেই নতুন শিকারকে। কিন্তু মরে যেত দেখে যে তার সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতাজাত সব সতর্কবাণী হেলায় তুচ্ছ করে আবার একজন আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরেছে লাইভ-ডেঞ্জার, সিদ্ধার্থকেই ; লাইফবেল্ট মনে করে ঝাঁপ দিতে হয়েছে সিদ্ধার্থের জীবনযমুনায়।

আমরা এমন ঘটনাও জানতাম যখন একজনের কাছে ধরা পড়ে গেছে সাগর অসাবধানতার জন্যে। সে যে কখনও কখনও একই সময়ে একাধিক মেয়ের সঙ্গে একই খেলা খেলছে এই তথ্য যখন দিবালোকের চেয়েও স্পষ্ট, মৃত্যুর চেয়েও সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে সাগরের প্রেমান্ধ কোনও তরুণীর রঙীন চশমা পরা চোখেও, যার পর আর কোনও এক্সকুস চলে না, তখনও সিদ্ধার্থকে দেখেছি, সে আনপার্টাব্ড্। কমপ্লিটলি আনপার্টাব্ড্। ঝড়ের সমুদ্রে ফুটো হয়ে যাওয়া নৌকায় ভেসে যেতে যেতে সবাই যখন দুর্গানাম জপছে, তখনও যে গে ক্যাভেলিয়ার এমন মুখ করে বসে আছে যেন অথৈ জলের অশান্ত মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে সেক্সপীয়ারের টুয়েলফ্থ নাইট-এর

ওয়াটার ব্যালে রূপ,—সেই তার সঙ্গেই শুধু তুলনা চলত সেদিন এই সিদ্ধার্থের,—এই সিদ্ধার্থ সরকারের, ভালোবাসার কুরুক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজি গুলিয়ে গেলেও যে ঘাবড়ায় না সেই চতুর সেনাধ্যক্ষ যে নাকি সাকসেসফুল রিট্রিটকে মেনে নিতে লজ্জা বা ভয় কোনওটাই পায় না, কারণ সে জানে সেই রিট্রিট অন্তিমে আবার দেখা দেয় সাকসেস হয়েই ; সুয়্যার সাকসেস হয়ে !

অনুরূপ অবস্থায় ধরা পড়ে গিয়ে বেরিয়ে যাবার একটা ঘটনা তো এখনও সেদিনকার অনেকেরই স্মৃতির শ্লেটে আজও জ্বলজ্বল করছে ; মুছে যায়নি মোটেই। প্রায়ই টেলিফোনে ঘটে যেত এমন দুর্ঘটনা আকছার। যেমন সেবার, এক সকালে, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে রমণীয় 'হ্যালো' কানে যেতেই সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করেছেঃ কে, লতা ?—ব্যস ! টেলিফোনের আরেক প্রান্ত আরেকটি কথাও না বলে সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে। সুযোগ দেয়নি সিদ্ধার্থকে আর একটি ছেঁড়াখোঁড়া ধ্বনির, একটি অক্ষরের ফুটো পয়সা পাঠাবারও বিদ্যুৎদূতকে বাহন করে। মনের দিনপঞ্জীর পাতা উল্টে যায় সিদ্ধার্থ অসম্ভব দ্রুত। লতা নয় ; আজ সকালে যার গলা রিসিভারের কাণে প্রথম শোনার কথা তার, তার নাম মীরা ; মীরা চৌধুরী। সব মেয়ের বলবার কথাই যে এক এতদিনের রমণীয় অভিজ্ঞতায় সিদ্ধার্থের তা অজানা নয়। কিন্তু সব মেয়ের বলবার গলাও যে এক, সিদ্ধার্থের এ অভিজ্ঞান এই প্রথম। যাক ; কিন্তু এখন কি করা ?

চোখে গ্লিসারিন দিল সিদ্ধার্থ সেদিন মীরার ঘরের চৌকাঠ পেরোবার আগেই। মীরা,—মীরা চৌধুরী বসেছিল মাটিতে মুখ নীচু করে। সিদ্ধার্থর পায়ের আওয়াজ পেয়েও মুখ তুললো না সে। মুখ তুললো কেবল তখনই, তুলতে বাধ্য হল আরকি, যখন, সিদ্ধার্থের চোখের জল টপ করে এসে পড়লো মীরার, মীরা চৌধুরীর কনুয়ের ওপর। আগেও অবশ্য দুফোটা, চোখের নয় ঠিক, গ্লিসারিন-চোখের

জল বাজে খরচা করতে বাধ্য হয়েছিলো সিদ্ধার্থ। মীরা টের পায়নি সে জল তার আঁচলে নিঃশব্দে পড়ায়। এবার সিদ্ধার্থ সেই স্লাইটলি নিজেকে এডজাস্ট করেছে, সেই লক্ষ্যভেদ করেছে অর্জুনের তীর মাছের চোখ। চমকে উঠে মীরা তাকিয়েছে মুখ তুলে; একি সিদ্ধার্থ কাঁদছে? ব্যস! আর একটি কথাও বলতে হয়নি সিদ্ধার্থ সরকারকে সেবারকার মতো; বিনাবাক্যব্যয়েই জয় হয়েছে ওয়াটারলুর যুদ্ধে!

॥ পাঁচ ॥

সেই সময়েই একদিন সিদ্ধার্থ হঠাৎ এসেছিলো ত্রিপুরারী কাঞ্জিলালের মেসে। ত্রিপুরারী কাঞ্জিলাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যে রেকর্ডের পর রেকর্ড করেছে, কেবল ইংরেজিতে কখনও প্রথম হতে পারেনি বলেই, ইংরেজিতেই পড়ছে এম-এ। সিদ্ধার্থ সরকার প্রায় কুবেরের একমাত্র, আর ত্রিপুরারী কাঞ্জিলাল প্রায় নিঃস্বের একাধিকের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, সন্তান। দুজনের পৃথিবী দুই প্রান্তের। তবু গড়ে উঠেছিলো অন্তহীন আন্তরিকতার সেতু দিন থেকে দিনে। সেই সেতুবন্ধন দুই জগৎকে করেছিল নিকট; পরকে করেছিলো বন্ধু; একে অপরকে করেছিল পরমাত্মীয়। ধনী দরিদ্রের বন্ধুর পার্থক্যকে জুড়েছিল বন্ধুর সূত্রে।

ত্রিপুরারী পড়বার এবং থাকবার খরচা চালাবার জন্যে সকাল-বিকেল ট্যুশান করত অগুন্তি। যে মেসে সে থাকত সে মেসের চেহারা দেখে মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয় যে, সে মেস বোধ হয় কলকাতার নাম যখন গোবিন্দপুর-সুতানুটি ছিলো তখনকার; অর্থাৎ বয়সে তা জব চার্নকের চেয়ে বড়। তবুও সেই মেসে সির্থার্থ সেদিন যত আনন্দ পেত, অত আনন্দ সে বোধ করি সেই জোয়ান বয়সেও রমণীসঙ্গসুখেও পেত না। ত্রিপুরারী কাঞ্জিলাল বড়লোক মাত্রকেই এড়িয়ে চলত দারিদ্র্যের দম্ভে; প্রতিভার বর্মে। কিন্তু সিদ্ধার্থের কথা স্বতন্ত্র; সিদ্ধার্থকে সে বড়লোক নয়, বড়মানুষ মনে করত। সিদ্ধার্থ না এলে পরপর কয়েকদিন সে চিন্তিত হতো; উদ্বিগ্ন হতো; কখনও কখনও সিদ্ধার্থের প্রাসাদে গিয়ে দেখে আসতে পর্যন্ত ইচ্ছে করত, সিদ্ধার্থ কেমন আছে। যদিও, সিদ্ধার্থ যে রেগুলারলি আসত সব সময় ত্রিপুরারী কাঞ্জিলালের কাছে, তা নয়। বরং বলা যায়, কখনও কখনও যেমন আসত এবেলা ওবেলা; তেমনই কখনও আবার পরপর অনেকদিন ধরে আসতই না তার

মক্ষিরাণীপরিবৃত যৌবনের নানা রঙের দিনগুলোয়। যখনই আসত এবং যেত, কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ের মতো কখন্ যেত এবং কখন্ আসত বলা শক্ত ছিলো তার একমাত্র অভিন্নহৃদয় বন্ধু ত্রিপুরারী কাঞ্জিলালের পক্ষেও।

যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখনও একদিন।

বাইরে ঘন অন্ধকার রাতের অনেক একটুখানি ছড়িয়েছিল ছাদময়। তারই মাঝখানে বসেছিলাম ইজিচেয়ারে; কামিনীফুলের গন্ধে ভেসে যাচ্ছিলো একফালি ছাদ ত্রিপুরারী কাঞ্জিলালের, জব চার্নকের চেয়েও বোধ হয় বয়সে বড়, সেই মেসের গা ফাটা ফাটা ছাদ। ঠিক সেই মুহূর্তে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার মতো ত্রিপুরারীর ঘরে এসে ঢুকল দীর্ঘ চেহারা, দুর্দান্ত হাসি আর দুচোখে দুরন্ত সেই তৃষ্ণা যার আরেক নাম, সিদ্ধার্থ সরকার।

অন্ধকারে ভূতের মতো চুপ করে বসে কেন? এনিথিং রং?

জবাবের জন্যে সিদ্ধার্থর জিজ্ঞাসা নয়। তাই ত্রিপুরারী চুপ করে বসেই রইল; সিদ্ধার্থই আবার ছাদ ফাটানো গলায় চীৎকার শুরু করল: নন্দ? নন্দ?

মলা,—নন্দর নেশায় জড়ানো ওড়িয়া উঠে এলো একতলা থেকে ছাদের তিনতলা ঘরে মন্দাক্রান্তায়: এতে পাটি করিছ কাই? আঁ?—চা হেউচি!

শুধু চায়ে হবে না রে বাবা নন্দ। সিদ্ধার্থ সমান গলায় অর্ডার দেয়: মহাবীরের ওখান থেকে গরম তেলেভাজা আনো—

কেতে?

ঝুড়ি সুদ্ধু তুলে আন, সিদ্ধার্থের হয়ে এতক্ষণে একটা কথা বলার ফুর্সৎ পায় বেচারী ত্রিপুরারী। সিদ্ধার্থ পঞ্চমে হাসল: ওকথা বলে লজ্জা দিতে পারবে না আজ ব্রাদার; অবশ্য কবেই বা পেরেছ? সেকথা নয়,—আজ দুঝুড়িও আনতে পার,—সারা বিকেল এক কাপ চা-ও জোটেনি—

কেন ?

Its a very very long story—যেতে দাও এখন—

না। জিজ্ঞেস করছি, লেটেস্ট কে? বাঙালী, পাঞ্জাবী, না কোনও অবাঙালী হরিণনয়না ?

সাগর-মুক্তোর মতো দাঁতের হাসির জবাব দেয়ঃ এবারেরটির বাড়ী সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে ; নাম—

থাক। নামে দরকার নেই, সেক্সপীয়ার বলেছেন, নামে কি এসে যায় ? কিন্তু—

কিন্তু কি আবার—

কিন্তু এরকম করে চলবে কতকাল ?

আরও বছর কুড়ি তো বটেই ?

তখন চল্লিশ বছর প্রায় বয়স হবে যে আমাদের সে খেয়াল আছে ?

Life begins at forty, old boy !—সোনার সিগারেট কেস থেকে ঠোঁটে উঠল সিদ্ধার্থর, প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রি।

॥ ছয় ॥

ত্রিপুরারী কাঞ্জিলালকে সিদ্ধার্থ কেবল ক্ষেপাবার জন্যেই বলেছিল, তার বাড়ি সাত সুমুদ্দুর তের নদীর পার। আসলে তার নামধাম সিদ্ধার্থ সরকার কিছুই জানতো না; কবির কথায় বললে বলতে হয়, শুধু তার বাঁশি শুনেছিল। কসমপলিটান ক্লাব তখন কলকাতার সবচেয়ে ফ্যাশানেবল্ স্পট। সেইখানেই একটি নতুন মেয়ে তার মন এবং নিশীথ রাত্রের নিদ্রাহরণ করেছিল, কাঞ্জিলালের কাছে যাবার এবং নীলির কাছে কথা দেবার বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। তাই নীলির কাছে কথা দিলেও, রোখের মাথায়, কোথাও যেতে চাইছিলো না তার মন। মেয়েটিকে দেখে নয়; মেয়েটির একটি কথায় চমকে গেছে সিদ্ধার্থ। কসমপলিটান ক্লাবে মেয়ে এবং ছেলেদের মিক্স্‌ড্ গ্যাদারিং কবে যেন সিদ্ধার্থ পুনরাবৃত্তি করেছিল; তার সেই বিখ্যাত শ্লোগানঃ 'মেয়েরা হচ্ছে ট্রাম-বাসের মতো; একটা ছাড়তে না ছাড়তেই, আরেকটা এসে হাজির!' ফস করে সেই মেয়েটি বলে উঠেছিলঃ 'ছেলেরা হচ্ছে আকাশে ওড়া ঘুড়ির মতো; তারা ভাবে তারা বুঝি স্বাধীন প্রজাপতি! বেচারারা জানে না যে লাটাই যাদের হাতে চিরকাল তারা পুরুষ নয় কোনওদিন; তারা চিরকাল মেয়েই।'

সিদ্ধার্থের মেয়ে নিয়ে মজার খেলা চৌচির হয়ে গেছে একটি আঘাতে। তার দুচোখে নেমেছে রমণীয় তপস্যার প্রথম রোদনভরা বসন্তের রাতে নিবিড় নীল ছায়া। মেয়েদের সঙ্গে মিশেছে এতকাল যে কারণে আজ এই একদিনের দেখা মেয়েটি সেকারণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে উদিত হয়েছে মনের গহন অন্ধকারে সিন্ধুপারে সবে মাত্র দেখা দেওয়া শুকতারার মতো। যৌবনস্বপ্নে ছেয়ে গেছে বিশ্বের আকাশ। কসমপলিটান ক্লাবে দ্বিতীয়বার দেখা মেলেনি সেই অদ্বিতীয়ার।

কাউকে তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায়নি সিদ্ধার্থ। যদি ধরে ফেলে সে শক্ত গ্রানিট নয়; তার মনও চোরাবালি; সেখানে আজ ধ্বস নেমে চুরমার করে দিয়েছে মেয়ে নিয়ে মজা করবার যতেক মিথ্যে দম্ভ। ধরা দেবার জন্যে, ধরা পড়বার জন্যে, অধরার হৃদয়-মাল্যের মুক্তবন্ধনে অধীর হয়ে উঠেছে সিদ্ধার্থ। একথা শুনলে কসমপলিটান এই সোসাইটি বলবে কি ?

কিন্তু লজ্জা নয়; নয় হেরে যাবার ভয়। আসলে মনের গোপন কথাটা সে মনেই রাখতে চেয়েছে। যদি তার স্বপ্ন অন্য কোথাও সঞ্চারিত হয়ে গিয়ে থাকে এর আগেই, তবে আর কেন, আবার আরেকটি স্বপ্ন ভাঙা, আরেকটি হৃদয়ভাঙার হৃদয়হীন খেলা। যদি সে জেনে যায়, জানতে পারে কোনও রকমে একবার যে তার সেই প্রথম রোদনভরা বসন্তের রাত বয়ে নিয়ে এসেছে যে জীবনে সর্বপ্রথম, সে যদি এখনই মন দিয়ে থাকে আর কোথাও তবে সারাজীবন তারই স্বপ্নে কাটিয়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে সিদ্ধার্থ। সমস্ত যৌবন মেয়েদের হৃদয় নিয়ে খেলার যে পাপ সে এতকাল করেছে, তারই প্রায়শ্চিত্ত করবে সারা জীবন ধরে একটি মেয়ের জন্যে একটি সে গানের কয়েকটি সেই কথায়ঃ যদিও বা নাহি আসে, তবু বৃথা আশ্বাসে—।

আস্ত দুটো দিন চলে যাবার পরেও যখন সিদ্ধার্থ এল না তখন পর্বত অর্থাৎ নীলিই মহম্মদ মানে সিদ্ধার্থর কাছে এল। শুধু যে এল তাই নয়, কেঁদেকেটে এক সিন করে বসল নীলি তার মামাতো ভাই সিদ্ধার্থর স্টাডিতে। সিদ্ধার্থর বেপরোয়া লাগামহীন তুরঙ্গজীবনে যে নেমেছে শ্রাবণ রাত্রির গভীর গহন; মেয়েদের নিয়ে মজা করবার বরফ ভেঙ্গে প্রথম ভালোবাসার বন্যা,—নীলি তার খবর রাখে কি ? আজ যার নিজেরই হৃদয় হয়েছে দুর্বল, তার কাছেই নীলি এসেছে আরেকজনের হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলার নিমন্ত্রণ নিয়ে। সিদ্ধার্থকে ছাড়ল না নীলি; ধরে নিয়ে গেল বাড়িতে জোর করে।

পর্দা সরিয়ে যখন সুমিত্রার ঘরে নীলি ঢুকল, সুমিত্রা তখন দেওয়ালের দিকে মুখ করে নিজের মনে বুনে যাচ্ছিল উলের কাঁটায় নতুন প্যাটার্ন। 'কাকে নিয়ে এসেছি দেখ',—নীলির গলা শুনেই সুমিত্রা যেই মুখ ঘুরিয়েছে, সেই সিদ্ধার্থের শরীরের সমস্ত রক্ত ছলাৎ করে ছড়িয়ে গেছে সারা মুখে। কোনরকমে দুহাত তুলে সিদ্ধার্থ বলেছেঃ আপনি? কসমপলিটান ক্লাবের সেই মেয়েই যে নীলির সুমিত্রা এ যেন তার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

সুমিত্রা, সেই কসমপলিটান ক্লাবের মতোই সমান সুপ্রতিভ কণ্ঠে বলেঃ আমি না তো কে আবার?

আপনি কি ভেবেছিলেন যে নীলি আপনাকে ডাচেস অভ উইণ্ডসারের সঙ্গে ইন্‌ট্রোড্যুস করাতে নিয়ে এসেছে? একটু থেমে আবার সিদ্ধার্থ বলেঃ বলিহারী যাই আপনার বুদ্ধির। এরই বড়াই করে আবার আপনার বোন নীলি? কসমপলিটান ক্লাবে আপনার চটুল মন্তব্যের চটুলতর জবাব যে মেয়ে দিয়েছিল তার সম্পর্কে এটুকু আন্দাজ করতেও পারেননি যে সে নিশ্চয়ই আপনার ব্যাপারে আরও কোনও কোনও রোমাঞ্চকর খবর আর কোথাও থেকে নিশ্চয়ই সংগ্রহ করেছে, নাহলে ও-মন্তব্য করা কেবল কথা বলার কায়দা জানা থাকলেই সম্ভব নয়; সেই সঙ্গে বলার কথা কিছু না জমলে বলা একান্তই অসম্ভব।

নীলির মুখের দিকে তাকাতে পারল না সিদ্ধার্থ আসার সময় সেদিন।

দ্বিতীয় ধাক্কা খেল সিদ্ধার্থ সুমিত্রাকে নিয়ে যেদিন প্রথম একা বেরুলো তার নিজের নতুন সিত্রোয়াঁয়। চিরকাল মেয়েদের পাশে নিয়ে গাড়ি চালিয়েছে; বলতে হয়নি, তারা বসেছে নিজে থেকেই; নিজে থেকে এসেই গা ঘেঁষে বসেছে মালিক-চালকের আসনের পাশে। এ মেয়েকে ভরসা হয়নি সে আমন্ত্রণ জানাতে। ভেতরের মহলের দরজা খুলে দিতেই, সুমিত্রা হেসে ড্রাইভারের মহলের

একদিকের দরজা খুলে বসতে বসতে বলেছেঃ পেছনে কেন? আমি কি অস্পৃশ্য নাকি?

না। পাশে বসতে বলতে ভরসা হয় না যদি মনে করেন কিছু—

মনে নয়,—বলতে চেয়েছিলেন, 'ভয় হয় যদি আমার',—কিন্তু ভয় করবে কেন? আপনি তো বাঘভাল্লুক নন। আর যদিই বা তাই হন,—আমি তো আর হরিণবাচ্চা নই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাবা গুটিয়ে বসতে হল বাঘকে, জয় হল সেই হরিণনয়নারই!

॥ সাত ॥

সিদ্ধার্থ আর সুমিত্রা; সুমিত্রা আর সিদ্ধার্থ।

এ যেন নীলিরই হার হল; সাঙ্ঘাতিক হার। তবুও হাল ছাড়েনি নীলি তখনও। নাটকের শেষ অংক পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে। সেই শেষ অংকের যবনিকা উঠল সুমিত্রার জন্মদিনে; সন্ধ্যায়। সবাই এল; এল না শুধু সিদ্ধার্থ। নীলির আনন হল উজ্জ্বল, অমাবস্যার অন্ধকার কেটে গিয়ে। কিন্তু রঞ্জনা যখন একা এল এবং বলতে পারল না সিদ্ধার্থ কোথায় তখন ভাবনার 'রাহু'-গ্রস্থ হল আবার নীলির মুখে পঞ্চদশীর চাঁদ।

সুমিত্রা তখন উঠে এসেছে ছাদে। সন্ধ্যার চাঁদ তখন ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণীর বাসরপ্রদীপ জ্বেলেছে মনের খুশিতে; তার হাসির বাঁধ ভেঙ্গে উছলে পড়েছে আলো। সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়েছিল ছাদে। সুমিত্রার হাতে তুলে দিল নীল একগুচ্ছ অপরাজিতা। সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞেস করল সুমিত্রাঃ তুমি এলে না কেন, সকলের সামনে দিয়ে।

সিদ্ধার্থঃ ভয় করে—

সুমিত্রা ঃ তোমার কিসের ভয় বুঝি না !

সিদ্ধার্থ ঃ পাছে তুমি ভুল বোঝো—

সুমিত্রা ঃ কিন্তু কেন ভুল বুঝব ?

—ভুল বুঝবে, কারণ আমি বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে মিলি না বলে ; আমি খাপছাড়া বলে— ; আজ তুমি আমায় যা দিলে সেদিন অন্য কিছুর নেশায় যদি তার কথা আমার মনে না থাকে ?

—কিছুমাত্র অনুযোগ করব না তার জন্যে। তোমায় যদি কিছু দিয়ে থাকি তবে আজ তোমার কাছে কিছু চাই ; তুমি আমাকে নাও—

সিদ্ধার্থ সুমিত্রার হাত দুটো ধরে জবাব দেয় ঃ আমিও তোমাকে এমনই করে চাই। পথ চলতে যিনি আমাদের দুজনকে হঠাৎ একদিন চিনিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছেয় যদি আমরা কোনওদিন বাঁধা পড়ি কোনও পরমাশ্চর্য লগ্নে, সেদিনও যেন আজকের মতো চিনতে ভুল না করি তোমায়—আজ তোমার জন্মদিনে বিধাতার কাছে আমার জন্যে এই মঙ্গল প্রার্থনাই কর।

এই বলেই সিদ্ধার্থ সুমিত্রাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল ঃ আজ চলি—

সুমিত্রা নিজেকে আজ নিবিড় করে ধরা দিয়ে সম্মতি দিল ঃ এসো।

শুতে গিয়ে নীলি সেদিন আশ্চর্য হল। একটু আগে সুমিত্রার অন্ধকার রাতের চেয়েও যেদুটো কালো চোখে জলের আভাস দেখেছিল, সেদুটো চোখেই এইমাত্র কিসের যেন খুশি নিজেকে আর ধরে না রাখতে পেরে, ফেটে পড়তে চাইছে কেবলই !

॥ আট ॥

প্রথম হার মানার জয়সংবাদ দেবার জন্যে সিদ্ধার্থ সরকার এসেছিল ত্রিপুরারি কাঞ্জিলালের মেসে। কিন্তু যেকথা বলতে এসেছিল সেকথা শেষ পর্যন্ত বলা হল না। এসে দেখল সেই পচা-গুমোট অন্ধকার মেসের সবচেয়ে হতভাগ্য সবচেয়ে দরিদ্র ঘরেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। ত্রিপুরারি কাঞ্জিলালের পাঠনিরস জীবনের হঠাৎ জানান্ না দিয়ে এসেছে রোদনভরা প্রথম বসন্তের দিন। ত্রিপুরারিকে সেই প্রথম সিদ্ধার্থ দেখল, টেবলের ওপর থেকে পড়ার বই সরিয়ে রবিঠাকুরের প্রেমের কবিতা পড়তে। 'কি পড়ছিস,' সিদ্ধার্থের প্রশ্নের উত্তরে ত্রিপুরারি পুনরাবৃত্তি করল: চিরদিন রবে মোর প্রেমের কাঙাল একথা বলিতে চাও বোলো। 'অঃ', মুখ দিয়ে বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ করে সিদ্ধার্থ নস্যাৎ করতে চাইল রবিঠাকুরের রচনা কি ত্রিপুরারির রুচিকে বলা শক্ত। ত্রিপুরারি কিন্তু নিজের গায়ে মাখল কথাটা: 'অঃ' করবার মতো কি হল? সিদ্ধার্থর সঙ্গে সঙ্গে রিটর্ট: 'রবিঠাকুর' তো একটাও প্রেমের কবিতা জীবনে লেখেন নি যাকে র‍্যালি প্রেমের কবিতা কওয়া যায়। যে কবিতা বিশেষভাবে একজনের কানের কাছে মৃদুস্বরে বিশেষ আরেকজন গুঞ্জন করতে পারে সে কবিতায় তোমার রবিঠাকুর কম্‌প্লিটলি নো হোয়ার হয়ে যাবেন। অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির কাছেও পাত্তা পাবেন না তোমাদের অদ্বিতীয় রবিঠাকুর।

ত্রিপুরারি কাঞ্জিলাল: কে পাত্তা পাবে ভাই?

সিদ্ধার্থ: শুনবি তাহলে কাকে বলে প্রেমের কাব্য; শোন তবে—

চল যাই আজকেই
ছুটি দিয়ে কাজকেই
আকাশের আল ধরে আমরা দুজন—

'মাইণ্ড ইট!' সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়ায়ঃ 'আকাশের আল,'—কল্পনার দৌড়ে রবিঠাকুর পারবে? তারপর শোনো—

পেরিয়ে এ পৃথিবীর
পথ-ঘাট-আলো-ভীড়
নীল মেঘ কি নিবিড় দেখা প্রয়োজন!
তক্‌ত্‌ নেই তাজ নেই,
সাজ নেই, লাজ নেই
ঘড়ি দেখা কাজ নেই; কোকিল কূজন।
সূর্যের ঝাঁজ নেই,
চাঁদমুখে ভাঁজ নেই
এই আলে খাঁজ নেই; জোয়ার-উজন্‌—

ত্রিপুরারি কাঞ্জিলালের কানে একটি কথাও যাচ্ছিল না।

সিদ্ধার্থের চোখ ত্রিপুরারির অন্যমনস্কতার ওপর গিয়ে পড়তেই সে থেমে গেল। ত্রিপুরারির সামনেই একখানা চিঠি খোলা পড়ে। সিদ্ধার্থ তুলে নিল চিঠিটা,

প্রিয় বন্ধু,

নীলির কাছে আমার সঙ্গে পরিচয়ে তোমার সঙ্কোচের কারণ শুনে দুঃখ পেলাম। আমি বড়লোকের মেয়ে, এই যদি তোমার বাধা হয় আমার বন্ধু হবার, তাহলে কি বুঝব যে আমরা দুজন একই ক্লাসের সহপাঠী নই? অথবা বন্ধুত্বের দাবীর কাছে অর্থের বাধা এত দুস্তর যে তা কোনও মতেই অতিক্রম্য নয়? কেন এমন হবে?

ছোট্ট চিঠির তলায়, সুমিত্রা মিত্রের স্বাক্ষর দেখেও বিন্দুমাত্র বিস্মিত হল না সিদ্ধার্থ সরকার। সইটা সুমিত্রার নয় সে একথা ত্রিপুরারির কাছে ভাঙা সঙ্গত হবে কি না তাই নিয়ে চিন্তায় পড়ল বরং।

চিঠিটা দিয়েছিল নীলি। সিদ্ধার্থের সঙ্গে সুমিত্রার লড়াই বাধাবার চেস্টায় যখন বিপরীতে হিত হল তখনই সে পড়েছিল ত্রিপুরারিকে নিয়ে নতুন খেলায় মাততে। ত্রিপুরারি যে সব বিষয়ে প্রথম হয়েও ইংরেজিতে এম-এ পড়তে এল কেবল সুমিত্রাকে হারাতে একথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি মাকড়শা-আরসোলারও জানা হয়ে গেছিল কয়েকদিনের মধ্যেই। এই সময়ই একটা বিতর্কসভার আয়োজন চলছিল ইংরেজি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে। সেই সভায় একমাত্র ছাত্রী বক্তা সুমিত্রাকে জব্দ করবার শেষ আশ্রয়রূপে দেখা দিয়েছিল নীলির কাছে ত্রিপুরারি কাঞ্জিলাল। বিতর্কের বিষয় ছিল : রবিঠাকুরের কাল্ সাহিত্যে বহুকাল বিগত।

ত্রিপুরারি কাঞ্জিলালকে তৈরী করল সিদ্ধার্থ সরকার। নিজের কথা না বলে ত্রিপুরারি তোতাপাখীর মত আওড়ালে সিদ্ধার্থের কথা :

রবিঠাকুরের কাল সাহিত্যে যে সত্যিই অনেকদিন চলে গেছে, একথায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই সায় আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তি নেই। নেই বললে কিছুই বলা হয় না ; বলতে হয়, রবীন্দ্রভক্তের এতে নিদারুণ আপত্তি। একেই বলে অন্ধ ভক্তি। এরই প্রতি সতর্ক হতে বলেছিলেন আরেক যুগন্ধর। 'বিওয়ার অভ্ মার্কসিস্ট' বলতে কার্ল মার্কস কি এই ধরনের যুক্তিবধির ফ্যানাটিক্সদের সম্পর্কেই আমাদের অবহিত হতে অনুরোধ করেন নি। মার্ক্স করেছেন, রবিঠাকুরও করতেন এদেশে না জন্মালে। করতেন, তার কারণ তাঁরা জানতেন যে কারুর যুগ চলে যাওয়া মানে তাঁর সমস্ত কন্ট্রিবুশানের মূল্য শূন্য হয়ে যাওয়া নয়। বরং সে ঘটনাই স্বাভাবিক এবং ইতিহাসসঙ্গত। রবিঠাকুর নিজেও বলেছেন, 'সব লেখা লুপ্ত হয় বারংবার লিখিবার তরে।'

একটু দম নিয়ে ত্রিপুরারি আবার সুরু করল : ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস-এর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। মধুসূদনের যুগ চলে গিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের যুগারম্ভে রবীন্দ্রভক্তরা গদগদ হয়, তখন

রবীন্দ্রনাথের যুগ চলে গিয়ে যুগান্তরের কথা উঠলেই তারা কেন তেড়ে আসে বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় চোখ কান খোলা থাকলে। ট্রামে অসম্ভব ভিড়ের পায়ে মাথা খুঁড়ে যে জায়গা করতে পারে, নিজের এক পা রাখার মতো একটুখানি জায়গা এই যুক্তিতে যে তাকেও তো ওই ভীড়ের আর সকলেরই মত করে খেতে হয়, সে-ও ট্রামে উঠেই দেখবেন, অন্য আর একজনও উঠতে এলে দেখবেন বলে, নেমে যান, নেমে যান, পরের গাড়িতে আসুন। এই হয়। শুধু ট্রামে-বাসে নয়; জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই এক স্বার্থের নীতিই একমাত্র নীতি। অন্য লোক অনেক যুগ ধরে টিকলে চীৎকার, ও কেন এতদিন সিংহাসন অধিকার করে থাকবে? তাকে সরিয়ে নিজে বসবার পালা আরম্ভ হতেই কিন্তু আর মনে থাকে না অথবা জোর করে বিস্মৃত হতে হয় যে এ পালারও শেষ হওয়া প্রয়োজন কারণ পালান্তর আছে বলেই একজনের যুগ শেষ হয়ে তার হুজুগ আরম্ভ হতে পেরেছে। কিন্তু সেকথা তুলে লাভ কি? অন্যের বেলায় যে অন্যায় অন্ধেও স্পষ্ট দেখতে পায় নিজের বেলায় তৃতীয় নয়নের সাহায্যেও তা অবলোকন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না প্রায়ই!

গলা শুকিয়ে এসেছিল ত্রিপুরারির। এক গেলাস জল খেয়ে ফের সুরু করলঃ যদি কেউ বলেন, মাইকেলের যুগের পর রবীন্দ্র-যুগে আপত্তি নেই, তার কারণ দুজনেই যুগন্ধর, তাহলে বলব তাদের বক্তব্যের ঠুনকো বস্ত্র যুক্তির ধোপে একেবারেই টিকবে না। কারণ যেহেতু প্রতিভার বিচারে মধু এবং রবি দুই বিরাট সেইহেতু মধুসূদনের যুগ, রবীন্দ্রনাথের যুগ চলবে; আর যেহেতু এখন রবীন্দ্রনাথের মতো অথবা সুদূর কাছাকাছিও কোনও একজন কেউ নেই, অতএব রবীন্দ্রোত্তর যুগ বলা চলবে না,—এ কোনও যুক্তির জোর নয়, গায়ের জোর! রবীন্দ্রনাথের পর একজন প্রতিভাধর নেই, সত্য; কিন্তু অনেক শক্তিমান দেখা দিয়েছেন যে তার বদলে একথাও অসত্য নয়।

মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথ একা যদি একটা যুগ হন, এরা তাহলে অনেকে মিলে আরেকটা যুগ হবেন না কেন, এ প্রশ্নের উত্তর নেই!

আসল কথা যুগের বিচার প্রতিভা দিয়ে নয়; যুগের বিচার হয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে। মধুসূদনের ছিল মহাকাব্যের দিন; রবীন্দ্রনাথ আনলেন গীতিকাব্যের ধারা। রবীন্দ্রোত্তর যুগের শিল্পীরা হবার চেষ্টা করেছেন, কৃষাণের আপন জন; কর্মে ও কথা তাদের সত্য আন্তরিকতা অর্জন করবার কৃতিত্বে যাদেরই মধ্যে থেকেই জন্ম নেবে সেই কবি যার জন্যে কান পেতে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের যুগ চলে গেছে তার কারণ সমাজে যারা সবহারা তাদের জন্যে রবির কোনও কবিকর্ম আজও অজানা। পথের ধারে কুষ্ঠরোগী কাৎরায় আর তার উল্টোদিকের প্রাসাদে নীল আলো জ্বেলে কোনও নীলাম্বরী যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত গায় তখন সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে যে পথের ধারের মানুষের স্থান তাঁর সাহিত্যে নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ্ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা হয়েও বাতিল হবার সময় তাঁর যে এসে গেছে সাহিত্যের আসর থেকে তার প্রমাণ রবিঠাকুর নিজেই দিয়েছেন ঐকতান রচনা করে।

হলের মধ্যে ছুঁচ পড়লেও আওয়াজ শোনা যাবে এমন রুদ্ধশ্বাস নিস্তব্ধতার মধ্যে ত্রিপুরারি কাঞ্জিলালের কণ্ঠে সিদ্ধার্থ সরকার যেন প্লেব্যাক করছেঃ বক্তব্যে দাঁড়ি টানার আগে বলি, গ্রীষ্মকালে কেউ যদি জলহীন গ্রামকে প্রাণ দেবার জন্যে একটি কি দুটি কূপ খনন করে কখনও কখনও তাতে তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হবারই কথা; কিন্তু যখন দেখি সেই দয়ালু ব্যক্তি কি শীত, কি বর্ষা, কি গ্রামে কি শহরে কেবল কুয়োই খুঁড়ে চলেছে তখন সন্দেহ হয় লোকটা হৃদয়বান না মস্তিষ্কহীন? রবিঠাকুর কয়েকটি অনবদ্য গান রচনা করে থামলে আমরা যুগবদলের প্রয়োজন অনুভব করতাম না; কিন্তু সারা জীবন পথের ধারের লোকটার কথা ভুলে কেবল আকাশপারে সুরের আসন পাতার আয়োজনেই যাঁর দিন কাটল তাঁর যুগ যদি আজও না গিয়ে

থাকে তাহলে জোর করে তা যাওয়ানো আমাদের পূত, পবিত্র, পরম একমাত্র কর্তব্য হবে বর্তমান মুহূর্তে।

প্রচণ্ড করতালির জালে আটকে পড়ে ত্রিপুরারির কথাগুলো শূন্যে আন্দোলিত হতে থাকলো।

উত্তর দিতে উঠল সুমিত্রা মিত্র। গোল গোল নিটোল শব্দের টুকরো বেরিয়ে আসতে লাগল; রঙীন বুদবুদের মতো তারা ছড়িয়ে যেতে লাগল ঘরময়। ত্রিপুরারির কথার ইন্দ্রজাল ছিঁড়তে ছিঁড়তে যুক্তির দুহাতে আস্তে আস্তে অক্টোপাশের মতো সুমিত্রার কনভিকশান কখন যে ত্রিপুরারিরও দম বন্ধ করে আনল, ত্রিপুরারি জানল না। তার মনে হতে লাগল, ইন্দ্রপুরীর কোনও রমণীয় যেন কথার প্রদীপে জ্বালছে মন্ত্রের অনির্বান শিখা। সুমিত্রা আলাপ করল কিছুক্ষণ 'রাগ' আরম্ভ করবার আগে: আমার প্রতিপক্ষ বলেছেন যে রবীন্দ্রযুগ বহুকাল বিগত; আমি বলছি. রবীন্দ্রনাথের যুগ আজও আরম্ভই হয়নি। যাঁরা ঐকতান কবিতার অজুহাতে পথের ধারের সেই লোকটার কথা বারবার তুলে যুক্তি দৌর্বল্যকে সেন্টিমেণ্টের ধোঁয়ায় ঢাকতে চাইছেন তাঁদের ভাবখানা যেন, চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি, অথবা আভাতি বেলা লবনাম্বুরাশে; কিম্বা আওয়ার স্যুইটেস্ট সাংস আ দোস দ্যাট টেল অভ স্যাডেস্ট থট বা ইট্স এ টেল টোলড্ বাই এন ইডিয়েট লেখবার কালে পথের ধারের সেই লোকটা বুঝি জন্মায়নি।

দুঃখ, কষ্ট, বেদনা কিছু রবীন্দ্রোত্তর যুগের একচেটে নয়; রবীন্দ্র-নাথের আবির্ভাবের আগেও ছিল, পরেও থাকবে। তাদের কথা সকল যুগের মহৎ সাহিত্যেই আছে; সকল যুগের মহৎ সাহিত্যে থাকবে। কিন্তু ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়ার, গেটে এঁরা কেউ বিশেষ কোনও যুগের, অথবা বিশিষ্ট কোনও দেশের কথা নয়। এঁরা যুগের নন; এঁরা চিরযুগের। হেম-নবীন-রঙ্গলালের যুগ এসেছে এবং গেছে; রবীন্দ্রনাথকে ধুত্তোর বলে উড়িয়ে দেওয়ার

চেষ্টাই যে রবীনধুত্তোর যুগের একমাত্র সাহিত্যকর্ম, সেরকম যুগও অনেক যাবে আসবে ; শুধু মাইকেল, বঙ্কিমের যুগ বাঙলা সাহিত্যে এবং সেক্সপীয়ার রবীন্দ্রনাথের যুগ বিশ্বসাহিত্যে কোনও দিন যাবারও নয় এবং আবার চাইলেই চট করে আসবার নয়।

সুমিত্রার যুক্তির পেরেক এতক্ষণে ত্রিপুরারির কথার প্রভাব শূন্য হয়ে আসা শ্রোতাদের মনের সাদা দেওয়ালে একের পর এক বিঁধছিল সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে। বুকের মধ্যে তাদের বক্তব্যের কঠিন হাতুড়ির ঘা পড়ছিল একের পর এক। সুমিত্রা যেন তার শ্রোতাদের অবস্থা বুঝে অত্যন্ত অবহেলায় জয়নিশ্চিত-ভঙ্গিতে আবার সুরু করল : ঐকতান কবিতার সুযোগে যারা রবীন্দ্রনাথকে ছোট করবার চেষ্টা করেন তাঁরা প্রথমেই সে কথা বিস্মৃত হন যে ওই ঔদার্য একমাত্র তাঁকেই মানায় যিনিই কেবল তার কীর্তির চেয়ে মহৎ। তাঁর সাহিত্য বিচিত্রগামী হয়েও সর্বত্রগামী হয় নি। কিন্তু যাদের রচনা অধোগামীই হয়েছে শুধু কিছু হয়ে থাকলে, এ কবিতা তাদের মুখে তেমনই শোনায়, ভূতের মুখে যেমন শোনায় রাম নাম। কিন্তু সেকথা নয়। যে আরও একটা কথা এরা প্রায়ই ইচ্ছাকৃত বিস্মৃত হয়, তা হচ্ছে ঐকতান কবিতায় কবি যেমন নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণ করেছেন তেমনই সতর্ক করেছেন তাদের, সেই আধুনিকদের যারা নকল সৌখীন মজদুরীর সাহায্যে বাহবা কুড়োবার চেষ্টায় ব্যস্ত। চুরি করে কখনও কখনও বড়লোক হওয়া গেলেও, বড় কবি হওয়া যায় না কোনও কালেই, না রবীন্দ্রপূর্ব, না রবীন্দ্রোত্তর যুগে !

বহুক্ষণ ধরে উত্তর ঘরের হওয়ায় এবার লঘুপক্ষ রঙ্গের রঙ্গীন প্রজাপতি উড়িয়েছিল সুমিত্রা : আমার প্রতিপক্ষের তুলনায় আমার বক্তব্য অনেক সংক্ষিপ্ত হবে। কারণ, প্রতিপক্ষ যদি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দিতেন তাহলে যুক্তি দিয়ে কাটাতে কিছু সময় নিতাম। শুধু সুযুক্তি নয়, কুযুক্তিও দেন নি একটাও ! ফলে, আমার বলার কথা, কথা বলা সুরুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সারা। কারণ বিরামবিহীন

বকে যাওয়ার দৌড়পাল্লায় প্রলাপের সঙ্গে আর শব্দকল্পদ্রুম রচনার ক্ষেত্রে শূন্য কলসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যে কারুর পক্ষেই অসম্ভব ; আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

অট্টহাস্যে ঘরের চাল নেমে আসবার মুহূর্তেই আবার রাশ টেনে ধরে সুমিত্রা : আমার প্রতিপক্ষ তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে যুক্তির পরিবর্তে ক্যারিকেচর আশ্রয় করে বলেছেন যে, কোনও লোক সারা জীবন কুয়ো খনন করে গেলে তাকে পাগল ভাবা ছাড়া গত্যন্তর কি ? কিন্তু কোনও লোক যদি কেবল কুয়ো না খুঁড়ে থাকে ? কখনও তৃষ্ণার্তর জন্যে বারি, অজ্ঞানের জন্যে আলো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গানহীন দেশে গান, প্রাণহীন দেশকে প্রাণ দিয়ে থাকে তাহলে তাকেও কি পাগল বলা যাবে ? যদি যায় তাহলে বলব বসুন্ধরা যে আজ বাসযোগ্য হয়েছে সে এইরকম গুটিকতক পাগলের জন্যেই। রবীন্দ্রনাথ এই পাগলদের একজন ; সেক্সপীয়ার আরেকজন।

বিতর্কে সেদিন বিচারকের রায় দেবার আগেই সকলের মর্মগত হয়েছিল, জয় হয়েছে কার। সকলের আগে হয়েছিল ত্রিপুরারির।

নীলি ত্রিপুরারির মুখে কি পড়ল কে জানে হঠাৎ তার কথামালার ব্যাংএর কথা মনে পড়ে গেল। খেলবার ইচ্ছে হল একটু। ত্রিপুরারিকে সুমিত্রার সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন করে তুললো আস্তে আস্তে। ত্রিপুরারিকে তারপর একদিন চিঠি লিখল সেই, সুমিত্রার স্বাক্ষর জাল করে।

।। নয় ।।

সুমিত্রার কাছে গিয়ে পৌঁছল একদিন নীলির লেখা সেই চিঠির জবাব। সুমিত্রা ডেকে পাঠাল ত্রিপুরারিকে। ডেকে বলল: এত বিষয় মাথায় ঢোকে আর এই সহজ জিনিসটা মাথায় ঢোকে না যে আপনার সঙ্গে কারুর প্রেমে পড়া সম্ভব নয়। যদি না ঢোকে তো আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখলেই তো হয়।

সমস্ত মুখখানা মড়ার মতো সাদা হয়ে যায় ত্রিপুরারির; ঠোঁট কাঁপে কথা বেরোয় না। চলে যায় নীলির লেখা চিঠির ঠাট্টা বুঝতে না পারা গ্রাম্য তরুণ।

সিদ্ধার্থ এসে দেখে, সুমিত্রা হাউ হাউ করে কাঁদছে। সিদ্ধার্থ যত জানতে চায়, কি ব্যাপার, তত ফুলে ফুলে কেঁদে ওঠে সুমিত্রা। এত রূঢ় কথা সে কোনও দিন কাউকে বলেনি। আজ নীলির উপহাসের পাত্রকে যেভাবে সে আঘাত করেছে তা সে কেবল ত্রিপুরারির মন থেকে সুমিত্রার স্বপ্ন মুছে দেবার জন্যেই যে একথা সে কাকে বোঝাবে। কিন্তু ত্রিপুারির চলে যাবার পর থেকেই, ত্রিপুরারির মুখ মন থেকে আর মুছে ফেলতে পারছে না কেন সুমিত্রা, কে বলবে!

সিদ্ধার্থের তিরস্কারের উত্তরে নীলি বলল: হাউ সিলি, একটা রসিকতা বুঝতে পারে না যারা এবয়সে তারা ইংরেজিতে এম-এ পড়তে আসে, কোন্ সাহসে?

বলে, বেরিয়ে যায়, নতুন গাড়িতে, বন্ধুর বার্থডে পার্টিতে!

পরপর চারদিন যখন ত্রিপুরারি এল না ক্লাসে তখন সুমিত্রা গেল

ত্রিপুরারির মেসে। ত্রিপুরারিকে তখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসপাতালের কেবিনে অচৈতন্য ত্রিপুরারির পাশে বসে ত্রিপুরারির মা। সুমিত্রাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ আচ্ছা, সুমিত্রা কে জানো মা? সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল, কেন বলুন তো? সুমিত্রার মা বললেনঃ প্রলাপের ঘোরে কেবলই বলছে, সুমিত্রা আমি কোনও দিন আর তোমার সামনে আসব না, কথা দিচ্ছি! শুধু তুমি আমাকে কুৎসিত বলে অমন করে ঘৃণা কোরো না!

ত্রিপুরারির মায়ের কোলে মাথা গুঁজে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগল সুমিত্রা।

জ্ঞান ফিরে এল না আর ত্রিপুরারির। হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরী হয়ে গিয়েছিল ত্রিপুরারিকে। আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে মারা গেল ত্রিপুরারি কাঞ্জিলাল। ইংরেজিতে দ্বিতীয়; অন্য সব বিষয়ে অদ্বিতীয়ই রয়ে গেল সে।

সিদ্ধার্থ সরকার দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজের ডেকে। বিলেতে যাচ্ছে সে ডাক্তার হতে। বাড়ির সবাই এসেছে শুভেচ্ছা জানাতে; আসেনি শুধু সুমিত্রা মিত্র। সুমিত্রা বসে আছে বাড়িতে; সিঁথির সিঁদূর আর হাতে নোয়া, মাথায় ঘোমটা পরা নববধূ সুমিত্রাকে কেউ আনতে পারেনি সিদ্ধার্থের জাহাজে। ত্রিপুরারি মারা যাবার রাত ভোর হবার পর থেকেই তার মাথার গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেছে। তার সেই বদ্ধমূল ধারণা আজও ভাঙেনি যে সে বিবাহিত; আর ত্রিপুরারি যে মৃত, তা-ও বোঝানো যায়নি সুমিত্রাকে আজও!

সিদ্ধার্থ পকেট থেকে বার করল হীরের আংটি। আজ সুমিত্রার হাতে পরিয়ে দেবে বলে, নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। হীরের আংটি ছুঁড়ে দিল জলে। তারপর তাকিয়ে রইল সেই জলের দিকে,

যেখানে তার যত কিছু বলা আর যা কিছু না বলা কথা নিয়ে হারিয়ে গেছে সেই হীরের আংটি।

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরের নায়ক ডাক্তারের পরিচয় গোপন করবার আর প্রয়োজন নেই। ডাক্তারের নাম,—সিদ্ধার্থ সরকার।

———